চীন-জাপানের ভ্র-ম-ণ

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ, প্রণীত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞানের অধ্যাপক
ও 'নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর', 'বর্ত্তমান জগৎ' প্রভৃতি
গ্রন্থ-প্রণেতা
শ্রীবিনয়কুমার সরকার
লিখিত ভূমিকা সম্বলিত

প্রাপ্তিস্থান
কমলা বুক ডিপো, লিমিটেড,
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

উপহার

উৎসর্গপত্র

পিতৃদেবের শ্রীচরণে

অকৃতী সন্তান

শচীন্দ্রনাথ

ভূমিকা

বিদেশের খবর রাখা ভারতবাসীর চোদ্দ পুরুষের কোষ্ঠীতে লেখা নাই। সংস্কৃত ভাষায় যে সাহিত্য আছে তাহার বহর অতি বিপুল। কিন্তু এই বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের ত্রিসীমানায় ভারতের বাহিরের কোন মুল্লুকের টিকি দেখিতে পাওয়া যায় না।

যুগের পর যুগ ধরিয়া ভারতীয় নরনারী অনেক প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানে ওস্তাদি দেখাইয়াছিল। তাহার ফলে এশিয়ায়, আফ্রিকায় আর ইয়োরোপে ভারতীয় সংস্কৃতি বা হিন্দু সভ্যতা "চরৈবেতি" ও দিগ্ বিজয় চালাইতে পারিয়াছিল। জগতের নানা মুলুকে বিরাজ করিত "বৃহত্তর ভারত"।

কিন্তু সেকালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের আ[illegible]কিও ছিল মন্দ নয়। উঁহাদের যতগুলা দোষ বা দুর্ব্বলতা ছিল তাহার ভিতর নং ১ হইতেছে দেশ-বিদেশের নরনারী সম্বন্ধে প্রায় ষোল আনা অজ্ঞতা। ভূগোলবিদ্যায় আর দুনিয়ার ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের ঠাকুর-দাদাদের ঠাকুরদাদারা ছিলেন চরম আনাড়ি।

একালের ভারতসন্তান আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কোনো-কোনো দুর্ব্বলতা কাটাইয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছি। পৃথিবীর

ভিন্ন-ভিন্ন দেশ সম্বন্ধে চর্চ্চা করা তাহার অন্যতম লক্ষণ। দুনিয়ার হরেক প্রকার নরনারীর ঘর-সংসার, খোরপোষ, চলাফেরা, লেনদেন ইত্যাদি সম্বন্ধে ওয়াকেব্‌-হাল হওয়ার দিকে আমাদের মেজাজ খেলিতেছে। বিদেশ-চর্চ্চায় সময় দেওয়াকে আমরা আর সময়ের অপব্যয় বিবেচনা করি না। ভারতবর্ষের অন্যান্য জনপদের কথা ছাড়িয়া একমাত্র আমাদের বাংলাদেশের দিকে তাকাইলেও এই কথাটা বেশ সম্‌ঝিতে পারি। বাঙ্গালীর লেখা বাংলা ও ইংরেজি রচনায় বিদেশ-চর্চ্চার ঘর আস্তে আস্তে বাড়তির দিকে চলিতেছে।

একুশ-বাইশ বৎসর হইল, সন ১৯১৫—১৬ সালে,—আমি জাপান, কোঁড়ীয়া, মাঞ্চুরিয়া ও চীন মুলুকে বৎসর দেড়েক কাটাইয়াছি। এই সকল দেশের লোকজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাও কায়েম হইয়াছিল। তাহারা আমাকে "হিন্দু ভাই" বা "হিন্দু দাদা" বলিয়া ডাকিত। কিন্তু তখনকার দিনে চীন-জাপান সম্বন্ধে ভারত-সন্তানের বই বা প্রবন্ধ বাংলা ইত্যাদি ভারতীয় ভাষায় অথবা ইংরেজিতে বড় একটা পাওয়া যাইত না। সে দুরবস্থা কিছু কিছু কমিয়া আসিতেছে। চীন-জাপানে আজকাল ভারতীয় পত্রিকাবলীর জন্য ভারত-সন্তানেরাই নিত্য-নৈমিত্তিক সংবাদ-দাতারূপে মোতায়েন আছে। ইহা একটা একালের বড় কথা।

"চীন-জাপানের এ-ও তা"—লেখক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতায় বসিয়াই বাংলা ভাষায় যে সকল মাল বাঁটিয়া দিলেন তাহা দেখিয়া বুঝিতেছি যে, বাংলার যুবারা ভূগোল-বিদ্যাটাকে খানিকটা নিজ কব্‌জার ভিতর আনিতে

পারিয়াছে। বইটার মারফৎ লেখক চীনা-জাপানীদের "হাঁড়ির খবর" আর বহু সংখ্যক খুঁটিনাটি বাঙালী গৃহস্থের হেঁসেল-ঘর পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। বৃত্তান্তগুলা বস্তুনিষ্ঠ ও সরস।

এই লেখকের দৃষ্টান্ত অনুকরণযোগ্য। বাংলার অন্যান্য যুবারা,—মায় বি-এ, বি-এস্-সি ফেলওয়ালারাও,—বাংলা সাহিত্যের আকার-প্রকার ও ইজ্জদ বাড়াইবার জন্য দেশ-বিদেশের নানা প্রকার সেকেলে-একেলে কথার এ-ও-তা প্রচার করিতে উৎসাহী হউন। সহজেই একটা "আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ" বাংলা দেশের পল্লীতে-পল্লীতে গড়িয়া উঠিতে পারিবে। বাঙালীর সংবাদপত্রে, গ্রন্থাগারে, ইস্কুল-কলেজে, আর সুধী-সম্মেলনে "আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ" স্থায়ী ঘর করিয়া বসিলে বাঙালী জাতির চিরপ্রিয় স্বদেশী ও স্বরাজ আন্দোলন দিকে-দিকে বিজয়কেতন উড়াইতে থাকিবে।

কলিকাতা
১২ই সেপ্টেম্বর
১৯৩৭

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

সূচীপত্র

সান্-ইয়াৎসেন।

চীন-জাপানের গ-ল্প-কথা

চীন পৃথিবীর মধ্যে একটি অতি প্রাচীন দেশ। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই যখন অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমগ্ন সেই সময় চীনে ছিল জ্ঞান ও সভ্যতার প্রচুর আলোক। কিন্তু সেই প্রাচীন যুগের জ্ঞানালোক প্রাপ্ত বহু নগরীও কালক্রমে ধ্বংসকে বরণ ক'রে নিতে বাধ্য হ'য়েছে। সেইখানেই হ'চ্ছে চীনের সঙ্গে তা'দের পার্থক্য। প্রাচীন গ্রীস, মিশর প্রভৃতি জ্ঞানে ও সভ্যতায় পৃথিবীর মধ্যে বেশ উচ্চ আসন লাভ ক'রে ছিল, কিন্তু আজ তা'দের অতীত গরিমা লুপ্ত প্রায়। যদি কেউ গ্রীসে উপস্থিত হন, তার গৌরবময় যুগের নিদর্শন দেখ্‌বার জন্য স্বতঃই তাঁর মনে ঔৎসুক্য উপস্থিত হবে, মিশরে গিয়ে সেকালের স্তম্ভের গায়ে ছবির আকারে লেখা দেখে ও তার অর্থ নির্ণয় ক'রে সেকালের রীতি-নীতি সম্বন্ধে ধারণা ক'রতে বেশ কষ্ট পেতে হবে। চীনও সেই প্রাচীন সহর কিন্তু খৃষ্টের জন্মের বহু পূর্ব্বেও সেখানে যে ধরণের লোক ও যে ভাষা

ছিল আজও সেখানে তাহাই প্রচলিত আছে। কাজেই দু' হাজার বছর আগেও চীনের সম্বন্ধে জান্‌তে কোন পরিব্রাজকের অসুবিধা হয়নি আজও তেমন হয় না। প্রাচীন কালে যখন বিখ্যাত রাজা সলোমন জেরুজালেমে রাজত্ব ক'রছিলেন ; মিশরীরা নীলনদের ধারে বহুনগরী ও প্রাসাদ নির্ম্মাণ ক'রে যুদ্ধবিদ্যা ও জ্ঞানচর্চ্চায় বেশ অগ্রসর হ'য়েছিলেন ; যখন বর্ত্তমান যুগের জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সভ্যতার কেন্দ্রস্থল ইংলণ্ড একটি নগণ্য ক্ষুদ্র দ্বীপ মাত্র বলে পরিগণিত হ'ত ; সেই সময়ও চীনদেশে বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও নগরীর সৃষ্টি হ'য়েছে।

মনে কর, তোমাদের মধ্যে 'প্রতাপ' সেই যুগেও বেঁচে ছিল। ভ্রমণের নেশা ছিল তার তীব্র, আর সেটা পূর্ণ হ'তে পেরেছিল তার পিতৃপুরুষের অর্থসংস্থানের ফলে। এদেশের নানা স্থানে ভ্রমণের পর হঠাৎ একদিন সাগর পারে যাওয়ার খেয়াল তাকে চেপে ব'সল এবং সেও সেই অনির্দ্দিষ্টের উদ্দেশ্যে একদিন বেরিয়ে প'ড়ল। বহু নদ নদী, সাগর ও দেশের সীমানা অতিক্রম ক'রে সে পৌছ্‌ল মিশরে। সেখানে কয়েকদিন তা'দের সুন্দর উদ্যানে বেড়িয়ে তা'দের মন্দিরের গায়ে ছবি এঁকে মনোভাব প্রকাশের অদ্ভুত ধরণ দেখ্‌ল, হিটিটিস্‌দের দেশে গিয়ে সেখানকার

বৃহৎ প্রাচীর বেষ্টিত নগরী দেখে সে চমৎকৃত হ'ল। ইংলণ্ডেও সে পদার্পণ ক'রতে ভোলেনি কিন্তু তখনকার ইংলণ্ড তাকে আদৌ আকৃষ্ট ক'রতে পারেনি। এখানে দেখ্‌ল শুধুই জঙ্গলপূর্ণ এবং সেই জঙ্গলে ও পর্ব্বতের গুহায় উলঙ্গ, অসভ্য কতকগুলি লোকের বাস। কিন্তু চীন দেশে গিয়ে তার ভ্রমণের সার্থকতা হ'ল। প্রকাণ্ড নগরী, তার মধ্যে কোথাও বা ধনী সওদাগর তা'দের বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত, কোথাও বা বিদ্বজ্জনমণ্ডলী অধ্যাপনা ও অদ্ভুত আকারের অক্ষর সাজিয়ে পুস্তক রচনায় রত। সমস্ত দেশটার মধ্যে চারিদ্দিকে যেন কিসের একটা সাড়া।

১৯১০ সালে পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের পর প্রতাপের ভারি ইচ্ছে হ'ল যে আর একবার পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণে গিয়ে তখনকার দেশের অবস্থা দেখে আস্‌বে। তাই ১৯১১ সালের অক্টোবর মাসে এদেশের দুর্গা পূজার আনন্দ উপভোগ ক'রে সে জাহাজে চেপে ব'সল। নূতন দেশ দেখ্‌বার ইচ্ছা থাক্‌লেও আগের বার যে সমস্ত দেশ দেখে গেছে সেখানে একবার ক'রে যাওয়ার ইচ্ছাও তা'র প্রবল ছিল। কিন্তু সে প্রথমেই শুন্‌ল সলোমনের রাজ্য আর নেই, বিভক্ত হ'য়ে গেছে। হিটিটিস্‌দের নগরীর কোন সন্ধানই পেল না। মিশরে দেওয়ালে আঁকা ছবি-

গুলো দেখ্‌তে পেল বটে কিন্তু তার অর্থ ক'রতে পারে এমন কা'কেও খুঁজে পেল না। ইংলণ্ডে গিয়ে ত তা'র স্বপ্ন-পুরী বলে মনে হ'ল। আগেকার ইংলণ্ডের সঙ্গে এখনকার ইংলণ্ডের আকাশ পাতাল তফাৎ। কিন্তু চীনদেশে গিয়ে সে দেখ্‌ল সেই পূর্ব্বনগরী, তেমনি সওদাগর তার বাণিজ্যে ব্যস্ত, গ্রন্থকার সেই পূর্ব্বের আকারের অক্ষরের সাহায্যে গ্রন্থ রচনায় রত এবং পূর্ব্বের রচিত গ্রন্থপাঠে সক্ষম লোকও বর্ত্তমান। সে সময় কৃষক যেভাবে জমি চাষ ক'রত এখনও সেই রকম ক'রছে। আগের বার এসে সে কিছু চীনা মুদ্রা সংগ্রহ ক'রেছিল। এই সমস্ত দেখে সেই মুদ্রার প্রচলন তখনও আছে কিনা দেখ্‌তে গিয়ে সে আশ্চর্য্য হ'ল যে তা'রই বিনিময়ে অনায়াসে তা'র পছন্দমত কতকগুলি সুন্দর জিনিষ পেল।

কিন্তু প্রতাপের এই অভিজ্ঞতা থেকে যদি তোমরা বোঝ যে, দু' হাজার বছরেও চীন কিছুই শেখেনি বা চীনে কোন উন্নতি হয়নি তা'হলে ভুল বোঝা হবে। যে সিল্কের জামা প'রে তোমরা নিমন্ত্রণ খেতে যাও বা প'রে বেশ আনন্দ অনুভব কর, সেই সিল্ক প্রথম আবিষ্কৃত হয় এই দেশে। চীনা মাটীর তৈরী কাপ, ডিস ও অন্যান্য সুন্দর সুন্দর জিনিষ এখানেই উৎপন্ন হয়। বহুপূর্ব্বেই

তারা বারুদের ব্যবহার জানৃত এবং বই ছাপ্‌বার নিয়মও তা'দের জানা ছিল। ট্যাক্সী গাড়ী বর্ত্তমান যুগের একটি নূতন আবিষ্কার, কিন্তু একজন বিখ্যাত পণ্ডিতের লেখনী থেকে জানা যায় যে, প্রায় ১৬০০ বৎসর পূর্ব্বেও চীন দেশে ট্যাক্সীর প্রচলন ছিল। তবে এখন যেমন মিটারে ভাড়া ওঠে তখন প্রতি ৪৫০ গজ গেলে 'ঢুং' করে একবার শব্দ হ'ত এবং এই রকম দশবার শব্দ হওয়ায় পর ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ত।

চীনদেশে যেমন বড় বড় নদী ও পর্ব্বত আছে তেম্‌নি খনিজ পদার্থেও চীন বেশ সমৃদ্ধ। এক চীনদেশে যে কয়লা আছে তা'তে সমগ্র পৃথিবীর লোকের হাজার বছরের প্রয়োজন মেটে। নদীর মধ্যে ইয়াংসিকিয়াং ও পীতনদীই সবচেয়ে বড়। একস্থানে ইয়াংসিকিয়াং প্রায় এক হাজার মাইল চওড়া। পীতনদীর স্রোত পর্ব্বত থেকে যখন সমতলভূমির দিকে ধাবিত হয় সেই সময় পীতবর্ণের প্রচুর কর্দ্দম স্রোতের সঙ্গে আসে এইজন্যই এর নাম পীতনদী। অনেক সময় বিশেষতঃ বর্ষাকালে জলবর্দ্ধিত হয় এবং হাজার হাজার চীনা দেশবাসীর ঘর-বাড়ী ভাসিয়ে ধ্বংস ক'রে দেয়। এই নদী অনেক সময় চীনাদের দুঃখের কারণ হয় ব'লে এর অপর নাম "অশ্রুমতী নদী"।

চীনের মত বড় দেশ সমগ্র এশিয়ার মধ্যে রুশিয়া ছাড়া আর নাই। আয়তনে ভারতবর্ষ অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ বড়। লোক সংখ্যাও অনুরূপ। ১৯২৩ সালে চীনে লোকসংখ্যা ছিল একচল্লিশ কোটিরও অধিক কিন্তু ভারতবর্ষে ১৯৩১ সালেও পঁয়ত্রিশ কোটির সামান্য বেশী মাত্র। এত বড় দেশেও অনেক সময় অধিবাসীদের বাস করার স্থানাভাব হয়, কাজেই অনেকে নদীবক্ষে নৌকার উপরেই বসবাস ক'রতে থাকে।

চীনদেশ সম্বন্ধে তোমাদের একটা ধারণা হ'ল কিন্তু দেশের নাম চীন হ'ল কেন জান কি? চীনের আদি ধর্ম্মগুরু ছিলেন কনফুসিয়াস। খৃষ্টের জন্মেরও বহুপূর্ব্বে এঁর জন্ম হয়। দেশের লোক তাঁকে দেবতার মতই ভক্তি করত এবং এঁর জীবিতকালে ইনিই ক'রতেন প্রজাদের সুখ-দুঃখের বিধান। কিন্তু এঁর মৃত্যুর পর চৌবংশের একজন শাসনকর্ত্তা হন এবং তাঁরই বংশধরেরা প্রায় আট শত বৎসর রাজত্ব করেন। এই সময় চীন দেশের ছোট একজন শাসনকর্ত্তা নিজেকে সম্রাট্ নামে অভিহিত করেন এবং তাঁরই নাম থেকে ক্রমে দেশের নাম চীন হ'য়ে যায়।

চীনা শিশু

বিভিন্ন দেশের শিশু একই উপাদানে গঠিত হ'লেও ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে দেশের রীতিনীতি অনুসারে তারা বিভিন্ন ভাবে পালিত হয়। চীনে শিশুকে ছোট্ট পাজামা ও খুব চক্‌চকে রঙের কোট পরিয়ে দেওয়া হয়। সময় সময় মাথায় একটা অদ্ভুত রকমের টুপিও থাকে। কখন বা তার টুপির চারিধারে পশমের তৈরী নানারকম জীবজন্তু ঝুল্‌তে থাকে এবং টুপির সামনের দিকে নানা রকম কাজ করা পশমের তৈরী একটা পান ঝোলে এবং পাশে শূকরের লেজের আকারে রেশম বা পশমের তৈরী একটা ঝোলে। এইটা যেন বাতাসে দুলে সেই সংসারে শিশুটির আর একটি ভাইকে আহ্বান কর্‌ছে। ছেলেদের বেলায় এটা সব সময় থাকে না। কিন্তু ছোট মেয়েদের কাণের পাশের কয়েকটা চুল একত্র বিনুনি ক'রে এইভাবে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এঁরও ঐ একই অর্থ। মেয়েদের বেলা এটা অবশ্যকর্ত্তব্য। তা'রা ইচ্ছা ক'রে এটা ক'রতে চায় না—কেননা পিতামাতা গরীব হ'লে ছোট ভাইকে পিঠে বেঁধে তাদেরই ব'য়ে নিয়ে বেড়াতে হয়।

অন্যান্য পোষাক এরা খুব কম প'রলেও প্রত্যেক শিশুর গলায় একটা রূপার হার থাকে এবং তাতে নানারকম আঁকা একটা লকেট ঝোলান থাকে।

এদেশে শিশুদের সম্বন্ধে নানারকম নিয়ম আছে। একমাস বয়স পর্য্যন্ত শিশুকে কোলে ক'রে শোয়াতে হবে, তারপর তাকে দোলনায় শুইয়ে দোল দিতে হবে, চার মাস হ'লে তাকে একটা ছোট্ট চেয়ার ক'রে দিতে হবে এবং এক বছর হ'লে তাকে যেখানে সেখানে নিয়ে যাওয়া যাবে বা অনেক সময় শিশু নিজেও হাঁটতে শেখে। একমাস বয়সে তাকে কেক ও চা খাওয়ান হয়, চারমাস হ'লে তা'কে শূকরের পা সিদ্ধ ক'রে খেতে দেওয়া হয় যা'তে তাড়াতাড়ি হাঁটতে শেখে এবং এক বছর বয়সে তার অন্নপ্রাশন হয়। এই সময় খোলা সমেত ডিম সিদ্ধ ক'রে প্রতিবেশীদের বাড়ী বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং তারা প্রত্যেকে ছুঁয়ে ফেরত দেয়। এই প্রথার অর্থ শিশু বড় হ'লে তার সঙ্গে কারও অসদ্ভাব হবে না। মেয়েদের বেলায় হাতে একটা লাল সুতো বেঁধে দেওয়া হয় এবং এর অর্থ বড় হ'লে সে চুরি ক'রবে না বা কোন জিনিষ ভেঙ্গেচুরে নষ্ট ক'রবে না। একটা খোলা সমেত ডিম সিদ্ধ ক'রে তার মাথার চারিদিকে ঘোরান হয় যা'তে তা'র

মাথাটা বেশ দেখ্‌তে ভাল হয় এবং ডিমের ভিতরের সাদা জিনিষটা তাকে খেতে দেওয়া হয় যাতে বড় হ'য়ে সে বেশ মিতব্যয়ী হয়।

আমাদের দেশে যেমন কোন শিশু প'ড়ে গেলে তাকে তাড়াতাড়ি কোলে তুলে মাটিতে দুই তিনটা লাথি মেরে শিশুকে সান্ত্বনা দেয় ওদের দেশেও সে প্রথা আছে।

শিশুর প্রথম জন্মোৎসব উপলক্ষে তা'র দিদিমা নানা রকমের পোষাক-পরিচ্ছদ নিয়ে শিশুকে দেখ্‌তে এসে দশ বার দিন থাকেন। এই সময় শিশুর মাতা-পিতাকে ভোজের ব্যবস্থা ক'রতে হয়।

মেয়ের প্রথম জন্মোৎসব হ'লে তা'কে একটা চেয়ারে বসিয়ে হাতে একখানা বই দেওয়া হয়। ঘরের মাঝখানে মেঝের উপর বাঁশের তৈরী একটা পাত্রে কাঁচি, বই, টাকা, চাউল, কচ্ছপ, সূতো প্রভৃতি বার রকমের জিনিষ রাখা হয়। তারপর শিশুকে সেই দিকে ছেড়ে দিয়ে সে কোন্ জিনিষটা তুলে নেয় দেখ্‌বার জন্য সকলেই অপেক্ষা ক'রতে থাকে। সূচ বা সূতো নিলে বয়নে বিশেষ দক্ষ হবে, টাকা নিলে ধনী হবে এইরূপ ধারণা সেখানে প্রচলিত। আমাদের দেশেও অন্নপ্রাশনের সময় এই রকম অনুষ্ঠানের প্রচলন আছে। এই উৎসবের পর অনেক

সময় শিশুকে তা'র মামার বাড়ীতে পাঠান হয় এবং সে বাড়ী ফিরে আসার সময় তা'র সঙ্গে দুটো মুরগী, পিষ্টক, মিছরি প্রভৃতি দেওয়ার রীতি আছে। ছেলে হ'লে সে কিছু রৌপ্যমুদ্রা ও একটা শূকর পায়। মেয়েদের দ্বিতীয় বাৎসরিক জন্মোৎসবের সময় লম্বা সরু আমাদের দেশের চুষি পিঠের মত ময়দার তৈরী এক রকম খাবার প্রতিবেশীদিগকে বিতরণ ক'রে শিশুর দীর্ঘজীবন কামনা করা হয়। প্রতিবেশীরা এর পরিবর্ত্তে ডিম ও টাকা দেয়।

উপরে যে সমস্ত কথা ব'ললাম এগুলো কেবল বড় লোকের মেয়েদের বেলাতেই খাটে। সাধারণ ঘরে অনেক সময় মেয়ে হওয়া মোটেই পছন্দ করে না, কেন না ছেলেরা ভবিষ্যতে রোজগার ক'রে খাওয়াবে আশা থাকে কিন্তু মেয়েদের কাছ থেকে কোন উপকারই পাওয়া যাবে না, বিয়ে হ'লেই শশুর বাড়ী চ'লে যাবে। সাধারণ ঘরের মেয়েদের সম্বন্ধে পরে আরও কিছু জান্‌তে পার্‌বে।

ক্রমশঃ মেয়েরা বড় হয় এবং আমাদের দেশের ছেলেদের মত হাত ধরাধরি ও দৌড়াদৌড়ি ক'রে নানা রকম খেলা করে। হাঁস ও খেঁক্‌শিয়ালীর খেলা এদের খুব প্রিয়। তা'দের মধ্যে আর একটা বেশ মজার খেলা

আছে ; কতকগুলো ছেলে দুই সার ক'রে গোল হ'য়ে ব'সে ট্যারো গাছ হয়। তা'দের মধ্যে একজন কৃষক হ'য়ে গাছের গোড়ায় জল দেওয়ার ভাণ ক'রতে থাকে। এই জল দেওয়ার ফলে ট্যারো গাছগুলো ক্রমশঃ বড় হয় এবং ছেলেগুলো দাঁড়িয়ে ওঠে। তারপর সেই কৃষক পরিশ্রান্ত হ'য়ে ঘুমানর ভাণ করে এবং সেই অবসরে একজন চোর হ'য়ে এসে যেন গাছ কাট্‌তে থাকে। সেই শব্দে হঠাৎ যেন কৃষকের ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং চোর দেখে তা'কে তাড়া করে। এই খেলাতে ছেলেরা বেশ আমোদ পায়।

———

চীনা বালক

ইংলণ্ড, জাপান প্রভৃতি অনেক দেশে বালকদের প্রাথমিক বিদ্যাশিক্ষা যে রকম অবশ্যকর্ত্তব্য চীনে সে রকম নয়। তবে এখানকার স্কুলের মাইনে বেশী নয় কাজেই মাতাপিতা যদি সন্তানকে শিক্ষা দিতে চান তা'তে বিশেষ অসুবিধা নাই। বহু বৎসর ধ'রে এখানে প্রথম বই প'ড়বার একই রীতি অনুসরণ করা হ'ত এবং অনেক সময় ছেলেরা শব্দের কোন রকম অর্থ না বুঝে মুখস্থ করে যেত। কিন্তু সে নিয়ম এখন আর নাই। শিক্ষার অনেক উন্নতি হ'য়েছে। এখন স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার সময় ছেলেরা পূর্ব্বের নাম ছেড়ে দিয়ে একটা নূতন ভাল দেখে নাম পছন্দ ক'রে নেয় এবং স্কুলে সেই নামেই পরিচিত থাকে। আজকাল তা'দের বইয়ে নানারকম ছবি এবং জর্জ্জ ওয়াশিংটন ও চেরী গাছ, বিদ্যাসাগরের সাঁতার দিয়ে নদীপার হ'য়েও মায়ের কাছে যথাসময়ে পৌছান প্রভৃতি ধরণের নানারকম উপদেশপূর্ণ সুন্দর সুন্দর গল্প আছে। আগে চীনা বালকদের খুব কম বিষয়েই প'ড়্‌তে হ'ত। কিন্তু এখন এদের মধ্যে পড়াশুনার জন্য বেশ উৎসাহ

জেগে উঠেছে। গবর্ণমেণ্ট ও দেশের বড়লোকেরা অনেক স্কুল স্থাপনা করায় পড়াশুনার সুযোগও বেড়ে গেছে এবং অনেক বিষয়েই তা'দের শিক্ষা লাভ ক'রতে হ'চ্ছে। কিন্তু ভাল শিক্ষকের এখানে খুবই অভাব।

আগেকার মত স্কুলে পড়ার সময়টা খুব বেশী করা হয়নি পাছে বেশীক্ষণ আটকান থাকার ফলে তা'দের পড়াশুনায় বিরক্তি এসে যায়। রবিবারের দিন ছুটি থাকে। কখন কখন আমাদের দেশের সংস্কৃত টোলের মত অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতেও বন্ধ থাকে। তা'ছাড়া নববর্ষ বা অন্যান্য উৎসবেও স্কুল বন্দ থাকে।

এদেশের ছেলেদের মধ্যে নানা রকমের খেলার প্রচলন আছে। ঘুড়ি উড়িয়ে ওরা খুব আমোদ পায় এবং নাতি থেকে ঠাকুর্দ্দা পর্য্যন্ত একদলে নানা আকারের ঘুড়ি তৈরী ক'রে একসঙ্গে উড়াতে দ্বিধা বোধ করে না। আধুনিক স্কুলের মধ্যে কোন কোন যায়গায় ক্রিকেট ও ফুটবল খেলা আরম্ভ হ'য়েছে। এদেশে জুয়া খেলার প্রচলন খুব বেশী, ছোট বড় সকলেই জুয়া খেলে এবং অনেক বাপ-মা ছেলেদের পয়সা দেন এই জুয়া খেলার জন্য। তোমরা যেমন মার্ব্বেল খেল, ওদেশেও পয়সা নিয়ে সেই রকম একটা খেলা আছে। প্রত্যেকে ওদের দেশের

একটা ক'রে মুদ্রা নিয়ে কোন দেওয়ালের কাছে গিয়ে দেওয়ালের গায় চেপে মুদ্রাটি ছেড়ে দেয় ; যার পয়সা সব চেয়ে বেশী দূর গড়িয়ে যাবে সে প্রথমে সেই পয়সা তুলে নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে দেওয়ালের গায়ে খুব জোরে ছুঁড়ে মার্‌বে যাতে পয়সাটা দেওয়ালের গায়ে লেগে অনেক দূর পর্য্যন্ত ফিরে আসে, প্রত্যেকে এই রকম ক'রে ছোঁড়ে। এদের মধ্যে যা'র পয়সা সব চেয়ে বেশী দূর আস্‌বে, সে সেইখানে দাঁড়িয়ে পয়সাটা তুলে নিয়ে অন্য যা'দের পয়সা প'ড়ে আছে সেইগুলো লক্ষ্য ক'রে মারবে। সে যে পয়সা মার্‌তে পার্‌বে তা' তা'র নিজের হ'য়ে যাবে। ফস্‌কে গেলেই সকলে মাটি থেকে পয়সা তুলে নেবে এবং গোড়া থেকে আবার খেলা আরম্ভ হবে।

আমাদের দেশের ঝিঁঝিঁ পোকার মত ওদেশে এক রকম পোকা আছে। তারাও ভীষণ শব্দ করে। অনেক সময় ছেলেরা দুটো দলে ভাগ হ'য়ে দুই দল থেকে দুটো পোকা নিয়ে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে কোন্ দলের পোকা জেতে আর কোন্ দলের হারে এই নিয়ে বেশ আনন্দ উপভোগ করে।

চীনা ভাষায় প্রথম শিক্ষার বইয়ের প্রথম পাতায় কোন অক্ষর নাই কেননা চীনা ভাষায় কোন বর্ণই নাই।

তার পরিবর্ত্তে ঝোপ বা পোষাক পরা একটা বুড়ো ছোট্ট একটা ছেলের হাত ধ'রে তাকে অভ্যর্থনা ক'রছে ; পাশে দিদিমার মত এক বুড়ী, তার কোলে একটা শিশু আর পাশে দাঁড়িয়ে একটা ছোট্ট মেয়ে—এই রকম একটা ছবি আঁকা আছে। পেছনে দাঁড়িয়ে বাবা ও মা। তাঁ'দের সকলের উপরে বড় ক'রে একটা ছবি আঁকা চীনা ভাষায় যার অর্থ হচ্ছে মানুষ। কোন কোন যায়গায় সূর্য্যাস্তের ছবি কিম্বা নীল সমুদ্র, পার্ব্বত্য ভূমি, পাইন গাছ প্রভৃতির ছবিও দেখা যায়। এই সবের উপরে আটটা কথা আঁকা আছে ; আটটা কথা মনে রাখ্‌তে অবশ্য কাউকেই বিশেষ কষ্ট পেতে হয় না। প্রথমে ছবিগুলো দেখে তা'দের নাম মুখস্থ ক'রে, পরে মানে বোঝে। প্রত্যেক অধ্যায়ে চার পাঁচটা নূতন কথার ব্যবহার দেখিয়ে দেওয়া আছে। এই ধরণের আটখানা বই প্রথম শিক্ষার্থীদের প'ড়্‌তে হয়।

চীনাদের ভাষাকে শিশুর ভাষা বলা যায়, কেননা বড় শব্দ এ ভাষায় আদৌ নাই ব'ললেও চলে। 'টা' (ta) ব'ললে ধন্যবাদ দেওয়া বোঝায়। চীয়া (chia) ব'লতে কল বোঝায় তা' সে সেলাইয়ের কল, ঘড়ির কল, টাইপ ক'রবার কল যাই হোক। বাংলায় আমি যাচ্ছি,

তা'রা যাবে, সে যায়, সে যেতে ইচ্ছা করে প্রভৃতি বোঝাতে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন রকমের বাক্য বিন্যাসের প্রয়োজন হয় কিন্তু এক বে-খি (Beh khi) ব'ললে এ ভাষায় সবই বুঝায়, এ ভাষায় প্রত্যেক জিনিষের জন্য এক একটা কথা আছে। পূর্ব্বেই বলেছি এদের কোন বর্ণ নেই, ছবির আকারে ভাব প্রকাশ করে এবং প্রত্যেক বিশেষ আকারের ছবির নির্দ্দিষ্ট নাম আছে ও এই ধরণের প্রায় ৫০,০০০ কথা আছে। চার হাজার সাড়ে চার হাজার অক্ষরের সঙ্কেত জানা থাক্‌লেই তাকে বিদ্বান বলা হয়। তবে লিখিত ভাষা চীনের সব প্রদেশে এক হ'লেও চলতি ভাষা উচ্চারণে অর্থের অনেক তফাৎ হ'য়ে যায়। যেমন এক রকম চিহ্ন থাক্‌লে চীনের সব যায়গাতেই তার অর্থ মানুষ বোঝায়। কিন্তু পিকিঙে মানুষকে জিন (jin) বলে এবং ক্যাণ্টনে বলে য়্যান্ (yan)। এ ভাষা সম্বন্ধে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ বেশ শক্ত ব'লে ধর্ম্ম-প্রচারক বা বৈদেশিক দূতের কাজ ক'রতে ইচ্ছুক বা যোগ্য ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ এ ভাষা শেখ্‌বার কষ্ট স্বীকার ক'রতে চান্ না।

চীনা বালিকা

ছোটবেলায় চীনা ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য থাকে না। তবে ছোট ছেলেরা সব সময় হ'লদে পোষাক পরে আর মেয়েরা পরে লাল। উভয়েই একসঙ্গে মিশে খেলা করে, দৌড়াদৌড়ি করে; কিন্তু মেয়েদের দুর্ভাগ্যের দিন আসে সেইদিন থেকে যেদিন মেয়ের মা একটা ফিতে হাতে তা'র পা বেঁধে দেওয়ার জন্য আসেন। বুড়ো আঙ্গুল বাদে আর চা'রটে আঙ্গুলকে একত্র বেঁধে তা'দের সঙ্গে গোড়ালিকে খুব জোরে বেঁধে দিয়ে যান; উদ্দেশ্য যাতে পা বড় হ'তে না পারে। চীনদেশে যে মেয়ের পা যত ছোট হবে সেই তত বেশী সুন্দরী ব'লে গণ্য হবে। সুন্দরী সাজ্‌তে গিয়ে চা'র পাঁচ বছর বয়স থেকে চীনা মেয়েদেরই এই কষ্ট সহ্য ক'রতে হয়।

ছোট্ট মেয়ে নিজের মনের আনন্দে নেচে গেয়ে স্বপ্নের জাল রচনা ক'রে তা'র দিন কাটাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ পা বাঁধার পর থেকেই তা'র সমস্ত আনন্দ মিলিয়ে গেল। এদিকে পায়ে যন্ত্রণা হচ্ছে অথচ কাঁদ্‌বার উপায় নেই। বাবা জান্‌তে পার্‌লে হয়ত তা'র

উপর আবার মার্‌বেন। সারারাত অনেক সময় তা'দের কেঁদে কেঁদেই কাটা'তে হয়, পায়ের যন্ত্রণায় ঘুমুতে পারে না। আধুনিক সভ্যতার পক্ষপাতী হ'লে অনেক সময় বাবা মেয়ের পা বাঁধা পছন্দ করেন না, তা'রাও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে।

চীনদেশে অতি শৈশবকাল থেকেই ছেলেমেয়েদের কাজ ক'রতে হয়। ছেলেবেলাতেই অনেক সময় তা'দের জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের জন্য ঝুড়ি নিয়ে পাহাড়ের উপর ও গাছতলা ঘুরে শুক্‌না পাতা, ঘাস, ডাল প্রভৃতি সংগ্রহ ক'রে আন্‌তে হয়। ছেলেকে মাঠে চাষের সময় বাবাকে সাহায্য ক'র্‌তে হয় আর মেয়ে বাড়ীতে ভাত রাঁধা, তরকারী কুটা ও পোষাক-পরিচ্ছদ তৈরীতে মাকে যথেষ্ট সাহায্য করে। জমি থেকে শস্য সংগ্রহের সময় কখন কখন মা, মেয়ে, ছেলে সকলকেই মাঠের কাজে সাহায্য ক'রতে হয়। বাড়ীর কর্ত্তা ও বড় ছেলেরা হয়ত শস্য কাটে এবং মেয়েরা সেগুলো আঁটি বাঁধে।

এখানে সাধারণ ঘরের মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়া শেখার চেষ্টা নাই বল্‌লেই চলে। বড় লোকের ঘরে যা'রা ইচ্ছা করে তা'রা পড়াশুনা করে। কিন্তু উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্তা চীনা মেয়ে খুবই কম।

ক্রমে মেয়ের চৌদ্দ পনের বছর বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবা মেয়ের বিয়ের জন্য এক ঘটক নিযুক্ত করেন। তা'রই সাহায্যে বিয়ের কথাবার্ত্তা হ'তে থাকে। আমাদের দেশের মত মেয়ের এ বিষয়ে অভিভাবকের কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করা অত্যন্ত নিন্দনীয়। অবশ্য তা'র মা যখন অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে গল্পচ্ছলে এই কথা উত্থাপন করেন তখন সে সবই শুন্‌তে পায়। পণপ্রথা ওদেশেও বর্ত্তমান। তবে ওদেশে মেয়ের বাপ্‌কে পণ দিতে হয় না, মেয়ের জন্য তিনিই পণ পান। বিয়ে ঠিক হওয়ার আগে শাশুড়ী কেমন প্রকৃতির লোক এ কথা জান্‌বার জন্য মেয়ের খুব ঔৎসুক্য হয়—কারণ, বউ-কাঁটকী শাশুড়ীর ওদেশে অভাব নেই।

বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেলে ছেলের বাড়ী থেকে গহনা, ভাল ভাল সিল্কের কাপড়ের টুক্‌রা প্রভৃতি মেয়েকে উপহার পাঠান হয়; মেয়ের বাবাকে এর পরিবর্ত্তে ছেলের বাড়ীতে তত্ত্ব পাঠাতে হয়। প্রায় এক সপ্তাহ ধ'রে পাজামা ও জুতো তৈরীর জন্য উভয় পরিবারই খুব ব্যস্ত থাকে। বার জোড়া বিভিন্ন রকমের ছোট ছোট জুতো চাই। মেয়ের বিয়ের কোট বরের বাড়ী থেকে আসে কিন্তু মেয়েও সেই কোটের নীচে প'রবার জন্য সিল্কের আর

একটা নিজে তৈরী করে। এ ছাড়া ভিতরে প'রবার জন্য একটা সাদা পাঁচ কোণ বিশিষ্ট কোট মেয়ের বিয়েতে একান্ত দরকার।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে বিয়ের দিন এসে পড়ে। আমাদের দেশে বর পাল্কী চ'ড়ে মেয়ের বাড়ীতে বিয়ে করতে যায়, কিন্তু এ দেশের প্রথা সম্পূর্ণ উল্টো ধরণের। বিয়ের বেশে সেজে মেয়ে পাল্কীতে চেপে বরের বাড়ী বিয়ে ক'রতে যায়। বর নিজে এসে পাল্কীর দরজা খোলে এবং সেই প্রথম দেখা-ই হয় আমাদের দেশের শুভদৃষ্টি। উন্মুক্ত আকাশের তলে এদের বস্‌বার স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়, এরা উভয়ে সেখানে প্রজ্বলিত বাতির সাম্‌নে হাঁটু পেতে বসে। মেয়ে বিয়ে ক'রতে আস্‌বার সময় এক জোড়া রাজহংস ও রাজহংসী নিয়ে আসে, কেননা এদের মতে এই পাখী দাম্পত্য প্রেমের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। নির্দ্দিষ্ট আসনের সাম্‌নে পাখী দুটোকে রাখা হয় এবং এদের সামনে বর জল ঢাল্‌তে থাকে, পরে বর-কনে পরস্পর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।"

এইবার কনে বরের সাম্‌নে মাথা নীচু করে; বরও কনের সাম্‌নে ঐ রকম করে—এর অর্থ স্বামী-স্ত্রীর সমান অধিকার দেখান। এর পর যা' কিছু অনুষ্ঠান পিতৃপুরুষের সমাধি মন্দিরে বা স্মৃতিস্তম্ভের সাম্‌নে হয়। বরের পিতা

হাঁটু পেতে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে জানিয়ে দেন যে, সংসারে একজন নূতন লোক এল। বর-কনেও হাঁটু পেতে মাথা নীচু ক'রে পূর্ব্বপুরুষদের সম্মান দেখায়। বিয়ের চা'র পাঁচদিন পরে স্বামী স্ত্রীকে নিয়ে শশুরবাড়ী যায় এবং তখন কনের বাবা আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের এক ভোজ দেন। বর-কনের প্রথম সাক্ষাতে তা'দের পরস্পর কথা বলার নিয়ম নেই, এমন কি প্রথম তিন দিন তা'দের হাসা কিম্বা কাঁদা পর্য্যন্ত নিষেধ।

বড়লোকের ঘরের মেয়ে হ'লে তা'দের যেভাবে দিন কাটে এতক্ষণ সেই কথা বলেছি, কিন্তু অনেক সংসার আছে যেখানে মেয়ে আদৌ পছন্দ করে না বা মেয়েকে একটা অযথা ভার ব'লে মনে করে। এই রকম একটা সংসারের সম্বন্ধে তোমাদের একটা গল্প বল্‌ব।

চীনের এক গ্রামে একটা লোক বাস ক'রত, তা'র নাম ছিল আবন। প্রকাণ্ড সংসারের কর্ত্তা সে ; দুই গ্রামের মাঝখানে তা'র জমিজমাও বেশ কিছু ছিল। একবার ঝিনুক নিয়ে দুই গ্রামের মধ্যে ঝগড়া হয় ; অবশেষে দুই গ্রামের মাতব্বর এসে মিট্‌মাট ক'রে দেন।

আর একবার আবনের গ্রামের একজন অন্য গ্রামবাসীর কাছে এক গরু বিক্রী করে। এর একটা

সর্ত্ত হ'ল এই যে, ঐ গরুর বাছুর হ'লে সেটা বিক্রী ক'রে গরুর আগের মালিককে কিছু দিতে হবে এবং তা'র বাছুর ও তা'র বাছুর হ'লেও তা'দের বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে প্রথম গরুর মালিককে কিছু অংশ দিতে হবে। কিন্তু গরুর বাছুর হ'লে তা'কে বিক্রী করার পর আগের মালিককে কত দিতে হবে এই নিয়ে বেশ গণ্ডগোলের সৃষ্টি হ'ল। ফলে এর মীমাংসা কথায় হওয়া সম্ভব নয় দেখে উভয় পক্ষই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এগুল এবং মাঠের কাজকর্ম্মের পর একটু অবসর হ'লেই তা'রা পরস্পর মারামারি করতে লাগ্‌ল।

ম্যাজিষ্ট্রেট এই খবর জান্‌তে পেরে উভয় গ্রামবাসী-দিগকেই রীতিমত জরিমানা কর্‌লেন, কিন্তু আবনের গ্রামের লোকদের জরিমানা হ'ল বেশী, কেননা এই যুদ্ধের ফলে তা'দের গ্রামের একজন মারা যায় ও অন্য গ্রামের যায় দু'জন; এই যুদ্ধে আবনের ভাই এই পক্ষের নেতা ছিল কাজেই জরিমানার অংশ তা'র ঘাড়েই পড়্‌ল বেশী।

আবনের অবস্থা তত ভাল ছিল না, কাজেই জরিমানার টাকা যোগাড় ক'রতে তা'কে কতকগুলা জমিজমা বেচ্‌তে হ'ল। দেশে ব'সে থাক্‌লে আর চলে না

দেখে ভাইয়েদের মধ্যে সকলেই সিঙ্গাপুর চ'লে গেল রোজগারের পথ খুঁজ্‌তে।

আবন তা'র বুড়ো বাপ-মা এবং নিজের ও ভাইয়েদের বৌ, ছেলেমেয়ে নিয়ে বাড়ীতেই রইল। প্রকাণ্ড সংসার। সংসার চালিয়ে কিভাবে এই অর্থের ক্ষতিটা পুষিয়ে নিতে পারে এই কথাই সে দিনরাত ভাব্‌তে লাগ্‌ল। হঠাৎ তা'র তিন বছরের মেয়ে আব্বাকে সাম্‌নে দেখে সে মনে মনে একটা মতলব ক'রল। মেয়েটার জন্য এক পয়সাও লাভের আশা নেই অথচ তা'র জন্য প্রতি মাসেই খরচ আছে; এ খরচটা অনায়াসেই বাঁচান যেতে পারে।

কয়েক সপ্তাহ পরে আব্বাকে তা'র বাবা সঙ্গে ক'রে বেড়াতে নিয়ে গেলেন। তা'র মা কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন এবং মার দেখাদেখি মেয়েও কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল কিন্তু বাবার চোখে জল নেই। কয়েক মাইল দূরে নদীর ধারে ছোট্ট একটা বাড়ীতে গেলে একটি স্ত্রীলোক এসে তা'দের অভ্যর্থনা ক'রলেন। তা'র বাবার সঙ্গে সেই স্ত্রীলোকটির কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা হওয়ার পর স্ত্রীলোকটি বল্‌লেন যে, বড়ছেলের বৌয়ের জন্য তিনি যথেষ্ট খরচ ক'রেছেন, কাজেই মেজ্ ছেলের বেলায় অত খরচ কর্‌বার ইচ্ছা নেই।

আব্বা এতক্ষণে বুঝ্‌তে পার্‌লে যে, তা'র বাবা তা'কে বেচে দিতে চান; তা'র কান্না আস্‌তে লাগ্‌ল,—মা, বাপ, ভাই, বোন ছেড়ে দূরে অনাত্মীয়ের মধ্যে তা'কে দিন কাটাতে হবে। কিন্তু তা'র কান্নায় কোন ফল হ'ল না। তা'র বাবা ধমক দিয়ে তা'কে শান্ত কর্‌লেন এবং তা'র ভাবী শাশুড়ীর কাছ থেকে একশ' টাকা নিয়ে তা'কে সেখানে বিক্রী কর্‌লেন। তবে সর্ত্ত থাক্‌ল যে, তা'র সঙ্গে ভাল ব্যবহার ক'র্‌তে হবে, বিয়ের বয়স হ'লে তা'র মেজ্ ছেলের সঙ্গে তা'র বিয়ে দিতে হবে ও সেই সময় একটা ভোজের ব্যবস্থা কর্‌তে হ'বে।

আব্বার এবার চরম দুঃখের দিন এল। সারাদিন তা'কে ভীষণ খাট্‌তে হ'ত এবং এরই মাঝে একটু খেলা করার চেষ্টা কর্‌লেই তা'র শাশুড়ী এসে তা'কে রীতিমত মার্‌তেন। রাত্রে সকলে যখন ঘুমুত তখন তা'র মনে পড়্‌ত তা'র মায়ের কথা, বুক ঠেলে তা'র কান্না আস্‌ত, চোখের জলে বালিশ ভিজে যেত।

যত বড় হ'তে লাগ্‌ল ততই তা'র কাজের চাপও বেড়ে যেতে লাগ্‌ল। তা'কে ঢেঁকিতে ধান ভান্‌তে হ'ত, পাতকূয়ো থেকে জল তুল্‌তে হ'ত, কাপড় কাচ্‌তে ও শুকোতে দিতে হ'ত এবং এরই মাঝে যদি সে

ছোটভাইকে পিঠে বাঁধিয়া চীনা বালিকা।

ভুলে মেয়ে ও ছেলেদের কোট একই তারে ঝুলিয়ে দিত তা' হলে আর রক্ষা ছিল না। যে কোন কাজে একটু ত্রুটি হ'লেই শাশুড়ীর কাছে ধম্‌কানি ত হ'তই মারও খেতে হ'ত; এই ভাবে সে ক্রমশঃই রোগা হ'য়ে যেতে লাগ্‌ল। তা'র বাবা মাঝে মাঝে তা'কে দেখ্‌তে আস্‌তেন বটে কিন্তু এর ফলে অনেক সময় আব্বাকে আরও উৎপীড়ন সহ্য কর্‌তে হ'ত।

একদিন সে সংবাদ পেল যে তা'রই মত একটা মেয়ে এই রকম অত্যাচার সহ্য কর্‌তে না পেরে জলে ঝাঁপ দিয়ে মরেছে। সেও এই রকম স্থির ক'রে একদিন তা'র শাশুড়ীর কৌটা থেকে আফিম্‌ চুরি ক'রে রাতে আফিম্‌ খেল। কিন্তু আফিমের মাত্রা কম হ'য়ে যাওয়ায় তা'র ইচ্ছা পূর্ণ হ'ল না ববং আরও অসুস্থ হ'য়ে প'ড়ল। এই সব দেখে তা'দের এক প্রতিবেশীর আব্বার উপর বড় দয়া হ'ল; সে এসে তা'র শাশুড়ীকে বল্‌লে, "মেয়েটাকে যে রকম খাটাচ্ছ তা'তে সে শীঘ্রই ম'রে যাবে। তোমার টাকা ত নষ্ট হবেই তা' ছাড়া ও ভূত হ'য়ে সমস্ত বাড়ীর উপর অত্যাচার কর্‌বে।" এই কথায় বুড়ী বেশ একটু ভয় পেয়ে গেল এবং এর পর থেকে বুড়ী আব্বাকে একটু যত্ন ক'রত ও বিশ্রামের অবসর দিত।

ক্রমে আব্বার ষোল বছর বয়স হ'ল ও তা'র বিয়ের দিন স্থির হ'ল। শাশুড়ী বুড়ী বেশ কৃপণ, কাজেই যথাসম্ভব কম খরচে বিয়ের ব্যবস্থা হ'য়ে গেল। নূতন পোষাক পেয়ে আব্বার মনে ভারি আনন্দ হ'ল। দীর্ঘ ষোল বছরের মধ্যে এই সময় তিন দিন তা'কে মোটেই কাজ করতে হয়নি।

এর পর থেকে তা'র দিনগুলো অনেকটা ভালভাবে কাটতে লাগল ; সংসারের অন্যান্য ছেলেদের বিয়ে হওয়ায় তা'র কাজের চাপ অনেকটা ক'মে গেল এবং এর পর যেদিন সেই বুড়ী শাশুড়ীটা ম'রে গেল সেদিন লোক দেখিয়ে চীৎকার ক'রে কাঁদলেও তা'র ইচ্ছা হচ্ছিল যে, কোথাও একটু লুকিয়ে প্রাণ খুলে খানিকটা হেসে নেয়।

নব বর্ষ

নব বর্ষের উৎসব প্রত্যেক সভ্য দেশেই হয়, তবে এখানে এই উৎসবের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। অনেক দিন আগে একবার শোনা গেল যে, বছরের শেষ দিন সমস্ত পৃথিবী উলট্‌পালট্‌ হ'য়ে যাবে এবং বন্যার জল এসে সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস ক'রবে। এ সংবাদে সকলেই খুব চিন্তিত ও দুঃখিত হ'ল। তা'রা বলাবলি কর্‌তে লাগ্‌ল যে, আজই যখন এ জীবনের অবসান হবে তখন যতক্ষণ বেঁচে আছি প্রাণ ভ'রে খেয়ে ও ভাল ভাল পোষাক-পরিচ্ছদ প'রে মনের সাধ মিটিয়ে নেওয়া যা'ক।

এই ব'লে তা'রা ভাল খাবার তৈরী ক'রে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে নিবেদন ক'রে দিয়ে সকলে একত্রে খেতে বস্‌ল। রাত্রে খুব ভাল ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে একটা চাপা দিয়ে রাখ্‌ল। সারারাত আলো জ্বালিয়ে সকলে উদ্বিগ্নভাবে বন্যার আগমন প্রতীক্ষা কর্‌তে লাগ্‌ল,—ঘুমুতে কা'রও সাহস হ'ল না।

ভোর বেলা তা'রা দরজা খুলে দেখ্‌তে পেল যে, বন্যার কোন চিহ্নই নেই, এইটেই নব বর্ষের প্রথম দিন। তা'রা

তখনই পরস্পর বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতে ছুটল কিন্তু কা'রও কোন ক্ষতি হয়নি দেখে পরস্পরকে অভিনন্দন জানিয়ে পানাহার ক'রে বিদায় নিল। সেই থেকে নব বর্ষের প্রথম দিন আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখাশুনা করা ও এই উপলক্ষে পানাহার ও নানা রকম আনন্দোৎসবের রীতি প্রচলিত হ'য়েছে।

ছেলেমেয়েরা সাগ্রহে এই দিনটার প্রতীক্ষা করে। বছরের শেষ কয়েক দিনে সকলেই খুব ব্যস্ত থাকে। নব বর্ষের পূর্ব্বে বাড়ী-ঘর পরিষ্কার ক'রতে হয় ও যা'র যা' দেনা আছে বছরের শেষ দিনের ভিতর শোধ করতে হয়; কেননা, বছরের প্রথমে কোনও দেনা থাকা নীতিবিরুদ্ধ। মেয়েরা কিছু কিছু নূতন পোষাক তৈরী ক'রবার জন্য ব্যস্ত থাকে এবং দোকানে অত্যন্ত ভিড় হয়, কেননা প্রত্যেকেই ঐ দিনটাতে কিছু কিছু নূতন জিনিষ ঘরে রাখ্‌তে চায়। ঘর-বাড়ী সাজানর ও নানা রকম খাবার জিনিষ তৈরী করবার ধূম লেগে যায়।

নব বর্ষের দিন ছোট ছেলে মেয়েরা যা'র যা' ভাল পোষাক আছে প'রে আনন্দ করে বেড়ায়। বেলা বারটার মধ্যে রান্না শেষ ক'রে অর্দ্ধ সিদ্ধ খাদ্য ভগবানের মূর্ত্তির সাম্‌নে ভোগ দেয় ও পূর্ব্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে নিবেদন ক'রে

দেওয়া হয়। নানা রকম ফুল দিয়ে উনুনের চারি ধার বেশ ক'রে সাজান হয়।

পূজার শেষে অনেকগুলো সোনালি কাগজের টাকা পোড়ান হয় ; এর অর্থ যে প্রেতাত্মারা ঐ অর্থের সাহায্যে পরলোকে ঐ দিন নানারকম ভাল ভাল জিনিষ কিনে আনন্দ উপভোগ করুন। এরপর ঐ সব খাবার ভাল ক'রে আবার পাক করা হয় এবং পরিবারের সকলে একত্রে আহার করেন ; সাধারণতঃ আমাদের দেশের মত প্রথমে পুরুষ ও পরে স্ত্রীলোকের খাওয়ার রীতি কিন্তু মাত্র এই একদিন সকলেই একসঙ্গে খান।

টেবিলের উপর একটা ছোট ষ্টোভ রাখা হয় এবং তা'তে মদ গরম ক'রে প্রত্যেকেই কিছু কিছু পান করেন। খাওয়া শেষ হ'য়ে গেলে বাড়ীর কর্ত্তা প্রত্যেককে কিছু পয়সা দেন, এর অর্থ যে সারাবৎসর তা'দের পয়সার অভাব হবে না। তারপর একটা পাত্রে ভাত ও মাংস দিয়ে কুকুর ও বিড়ালকে খেতে দেওয়া হয়।

ক্রমে সন্ধ্যা হ'য়ে আসে, প্রতি ঘরে আলো জ্বালা হয় ও প্রত্যেক দরজার পিছনে একখানা ক'রে আখ পুঁতে ঘরের মধ্যে প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে খাবার রাখা হয়। উৎসবের আনন্দে ঐদিন এত বেশী চেঁচামেচি হয় যে,

ইঁদুর ভয়ে গর্ত্তের বাইরে আসে না। এই প্রসঙ্গে ওদেশে একটা কথা প্রচলিত আছে যে, ঐদিন ইঁদুরের ছেলেমেয়ের বিয়ে তাই তা'দের বাইরে আস্‌বার অবসর থাকে না।

এইদিনে ছোট বড় সকলেই বাজী পোড়ায়। ছোট ছেলেমেয়েরা এইদিনের উৎসবে খরচ করার জন্য আগে থেকে পয়সা জমাতে থাকে। চারিদিকে বাজী পোড়ানর শব্দ, মাঝে মাঝে অগ্নিকুণ্ড ক'রে ছেলেরা তা'র চারিধারে নেচে নেচে গান গায়। প্রত্যেকেই সে রাত্রে বহুক্ষণ জেগে থেকে এইসব উৎসবে যোগ দেয়, কেননা তা'দের মধ্যে ধারণা আছে যে, ছোট ছেলেমেয়েরা ঐ দিন যত বেশীক্ষণ রাত জেগে থাক্‌বে বাড়ীর বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের তত বেশী দিন বাঁচ্‌বার সম্ভাবনা। অনেক সুবোধ ছেলেমেয়ে সারারাত জেগে থাকে। পরদিন সকালে পরস্পর দেখাশুনা করার প্রথা আছে এবং ঐ দিন খুব জুয়া খেলা হয়; কেউ কোন কাজ করে না।

চীনা সমাজ

চীনারা অত্যন্ত সংস্কারপ্রিয় ও বাইরের-নিয়ম কানুনের (formality) পক্ষপাতী। ওদের সমাজে যদি কাউকে নিমন্ত্রণ কর্‌তে হয় তবে লাল কাগজে তারিখ নির্ণয় ক'রে নিমন্ত্রণের তিনদিন আগে পাঠাতে হয়। এই পত্র পেয়েই তা'রা চিন্তা কর্‌তে আরম্ভ করে কি প'রে যাবে, কোন্‌ পোষাক প'রে গেলে তা'কে অন্য লোক অসভ্য বা অভদ্র মনে না করে অথচ সুন্দর দেখায়।

নিমন্ত্রণের দিন সকালে আবার একখানা লাল পত্র আসে তা'তে নির্দ্দিষ্ট সময় দেওয়া থাকে। নিমন্ত্রণের বাড়ী যদি মাত্র দুই তিন মিনিটের রাস্তাও হয় তবু পায়ে হেঁটে যাওয়ার প্রথা নেই। বড়লোকের বাড়ী হ'লে যদি পাশের কোন পর্ব্বত বা উঁচু যায়গা থেকে দেখা যায়, মনে হবে বাড়ীর ভিতরে যেন একটা গ্রাম, তা'র কারণ চীনা স্থপতি অনুসারে প্রত্যেক বড় ঘরের পৃথক্‌ ছাদ থাকা দরকার। পাশ্চাত্য দেশের মত ভোজে মেয়ে ও ছেলেদের একসঙ্গে ব'সে খাওয়ার রীতি নেই।

বাড়ীর ভিতর গেলেই গৃহস্থের সঙ্গে দেখা হবে, তিনি দুই হাত ধ'রে মাথা নীচু ক'রে অভিবাদন করেন এবং অতিথিকেও ঐ রকম করতে হয়। গৃহস্থের হাতে নূতন পেন্সিলের মত দুটো ক'রে কাঠি থাকে। এই সময় তিনি এ দুটোকে মাথা পর্য্যন্ত উঁচু ক'রে প্রত্যেক নিমন্ত্রিতের হাতে দেন। এ দুটো খাওয়ার কাঠি, কেননা ওদেশের লোক ভাত পর্য্যন্ত এই কাঠির সাহায্যে খায়।

ঘরের মধ্যে চা'র কোণ বিশিষ্ট টেবিল থাকে এবং প্রত্যেক টেবিলের ধারে আটজন ক'রে লোক বস্‌বার ব্যবস্থা থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানীয় অতিথিকে গৃহস্থের ঠিক বাঁ' ধারে বস্‌তে বলা হয় কিন্তু তিনি প্রথমে অন্য সাত আট যায়গায় বসেন এবং প্রত্যেক বারই সে যায়গা তাঁ'র উপযুক্ত নয় বলাতে সর্ব্বশেষে গৃহকর্ত্তার আসনের পাশে বসেন। তারপর অন্যান্য সকলে যে যা'র জায়গায় বস্‌লে ভোজ আরম্ভ হয়। খাবার সময় অন্যান্য জিনিষের মধ্যে সাম্‌নে দুটো পাত্রে জল থাকে, একটা খাওয়ার জন্য ও একটা দরকার মত যে কোন সময়ে হাত-মুখ ধোয়ার জন্য।

প্রথমে নানারকম ফল খাওয়া আরম্ভ হয়। তারপর আসে শূকর বা মুরগীর মাংস, ডিমসিদ্ধ, চুষি পিঠে ইত্যাদি। মাঝে মাঝে চিনির বিস্কুট ও আদার শিকড়ের

তৈরী খাবারও দেওয়া হয়। কিন্তু সব খাবারই খুব ছোট টুক্‌রা করা থাকে যা'তে কাঠি দিয়ে তুলে খেতে কোন অসুবিধা না হয়। কাঠি দিয়ে যা'রা খেতে অভ্যস্ত নয় তা'রাও ভোজের সময় হাতে ক'রে খায় না, কেননা সেটা ওখানকার ভদ্রতার বাইরে।

খাওয়ার সময় ব্যাণ্ড বাজে এবং নানারকম ধাঁধা'র প্রশ্ন করে। যেমন একজন বল্‌লে, "দুই বোন সারাদিন পৃথক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিন্তু রাত্রে একত্রে মেশে তা'রা কি ?"

উত্তর হ'ল, "দরজার দুটো কপাট।"

আবার কেউ বল্‌ল, "ছোট্ট একটা বাড়ীর সবই প'ড়ে গেছে তবু সে পাঁচজন অতিথিকে বেশ জায়গা দিতে পারে,—সেটা কি ?"

উত্তর হ'ল, "জুতো।"

এই রকম আনন্দের মধ্য দিয়ে ভোজ অগ্রসর হয় ; অনেক সময় কর্ত্তা তাঁ'র থালা থেকে কোন ভাল খাবার তাঁ'রই মুখের কাঠিতে তুলে কোন অতিথিকে দিলেন। অতিথির এজন্য বিরক্ত না হ'য়ে বিশেষ আদর-যত্ন ক'রে ঐ খাবার খেতে হবে। এরপর পান ক'রে পাত্রটাকে উপুড় ক'রে রাখা নিয়ম। খাওয়ার সময় প্রত্যেকেই চেঁচামেচি

করে এবং প্রত্যেককেই যে খাবার দেওয়া হবে তা'র প্রত্যেকটি অন্ততঃ কিছু খেতে হবে নতুবা গৃহস্থকে অপমান করা হবে। অন্য খাওয়ার শেষে ভাত ও চা দেওয়া হয়, এতেই বুঝ্‌তে হবে সেদিনের ভোজ ঐখানেই শেষ।

এদেশের চিকিৎসা সম্বন্ধে এবার কিছু ব'লব। আমাদের দেশে যেমন অনেক হাতুড়ে ডাক্তার আছেন যাঁ'রা এক বাক্স ওষুধ ও একখানা ডাক্তারী বই নিয়ে ব'সে নিজেদের ডাক্তার ব'লে প্রচার করেন; ওদেশেও সে জিনিষটার অভাব নেই। একটা লম্বা কোট প'রে ও মোটা এক জোড়া চশমা নিয়ে একটা দোকান খুলে ব'সলেই হ'ল, আলমারীতে খানকয়েক ম্যাজিকের বই বা যদি সম্ভব হয় দু'এক হাজার বছর আগেকার পুরাণ দু'একখানা ডাক্তারী বই রাখ্‌তে পারলে ত কথাই নেই।

শোনা যায় যে, পৃথিবীর ইতিহাসে যখন অস্ত্রোপচার অপরিচিত তখন চীনদেশে দু'একজন এমন লোক ছিলেন যাঁ'রা মাথা পর্য্যন্ত অস্ত্র ক'রে কৃতকার্য্য হ'য়েছিলেন, কিন্তু এ সমস্ত বিষয় নিজেদের মধ্যে গোপন রাখায় জগৎ এর দ্বারা উপকৃত হ'তে পারেনি।

গ্রাম্য ডাক্তারখানায় গাছগাছড়ার ওষুধ অনেক থাকে

যা'তে অনেক সময় উপকার হয়। বাঘের গায় খুব জোর, কাজেই দুর্ব্বল রোগীকে বাঘের মাংস খাইয়ে দাও—সেও সবল হবে। ছোটছেলের অসুখ হ'লে কেঁচো বা আরশুলা তা'র ওষুধ। ওদেশে একরকম কাঁকড়া পাওয়া যায়। আট দশ মাসের শিশু অসুস্থ হ'লে তা'র মাংস তা'কে খেতে হয়। এই গেল পথ্য দিয়ে রোগ সারিয়ে নেওয়ার কথা।

কঠিন অসুখে বাড়ীতে ডাক্তার ডাক্‌লে তিনি প্রথমে এসে বাঁ হাতের নাড়ী দেখেন heartএর অবস্থা বোঝ্‌বার জন্য। তারপর ডান হাতের নাড়ী দেখেন এবং এর সাহায্যে ফুস্‌ফুস্ ও লিভারের অবস্থা জান্‌তে চান। এতেও রোগ নির্ণয় ক'রতে না পার্‌লে জিব দেখেন এবং তা'তেও খুসী না হ'লে তাঁ'র সঙ্গে একটা মোটা ছুঁচ থাকে সেইটা শরীরের যে কোন অংশে বিঁধিয়ে দিয়ে মোচড় দেন—অর্থ যে কোন গ্লানি শরীরের ভিতর থেকে মুচড়ে বাইরে আনা; অসুখ যদি চোখেরও হয় তা'হ'লেও ঐ ব্যবস্থা।

এ ছাড়া এরা অনেক সময় নিজেদের সংস্কার অনুসারে কাজ করে। এক সময়, এক বুড়ীর চোখের অসুখ হয় এবং তিনি অনেক ওষুধ খেয়েও কোন ফল না পেয়ে শেষে

প্রত্যহ তিনটা থেকে পাঁচটা জ্যান্ত ব্যাঙ গিলে খেতেন। এতেই নাকি তাঁ'র চোখের অসুখ সেরে যায়।

এদেশে নানা রকম অসুখ আছে কিন্তু প্লেগ সব চেয়ে ভয়ের কারণ। এরা আগে এর জন্য অন্য কোন রকমে সতর্ক হ'ত না; কেবলমাত্র সময় সময় জামার আস্তিনের মধ্যে একটা মরা ইঁদুর নিয়ে বেড়াত। কারণ জিজ্ঞাসা ক'রলে ব'লত, "বিষে বিষক্ষয়।" ইঁদুরই যখন প্লেগের বীজ আনে তখন ইঁদুর সঙ্গে রাখ্‌লে আর প্লেগ হবে না। এখন অবশ্য এই সব মারাত্মক ব্যাধি দূর ক'রবার জন্য অনেক চেষ্টা হ'চ্ছে এবং দেশে অনেক হাসপাতাল ও সুচিকিৎসক হওয়ায় আগেকার অসুবিধা অনেক ক'মে গেছে। চীনারা অস্ত্রোপচারে বিশেষ পারদর্শী। অনেক মেয়েরাও আজকাল চিকিৎসা বিদ্যা ও শুশ্রূষার কাজ শিখ্‌ছে। অনেক সময় দেখা যায়, যেসব ছেলেরা ডাক্তারী পড়ে তা'রা ছুটির সময় গ্রামে গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দেয় ও স্বাস্থ্য রক্ষার সাধারণ নিয়ম জানিয়ে দেয়। ক'লকাতা সহরেও আজকাল অনেক চীনা ডাক্তার দেখা যায় বিশেষতঃ দন্ত চিকিৎসক।

চীনের গল্প

চীনদেশে টাকা থাক্‌লে অনেক সময় কি অঘটন ঘটান যায় সে সম্বন্ধে তোমাদের একটা গল্প বল্‌ব। চীনের এক গ্রামে আময় নামে একটা লোক বাস ক'রত। তা'র বেশ বয়স হ'য়েছিল কিন্তু সেই বুড়ো বয়সে হঠাৎ তা'র একটা সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করার ইচ্ছা হ'ল। তা'র যে বয়স তা'তে কেউ তা'কে স্বেচ্ছায় মেয়ে দেবে না তা' সে ভাল ক'রেই জান্‌ত; তাই টাকার জোরে মনের ইচ্ছা পূর্ণ হয় কিনা দেখ্‌বার উদ্দেশ্যে এক ঘটকী নিযুক্ত কর্‌ল ও একটি সুন্দরী মেয়ের ঠিকানা দিয়ে তা'র সঙ্গে তা'র বিয়ে দিয়ে দিতে পার্‌লে প্রচুর পুরস্কার পাবে ব'লে তা'কে লোভ দেখাল।

মুক্তা ছিল নিখুঁত সুন্দরী। একদিন ঘটকী তা'র বাবার কাছে গিয়ে প্রস্তাব ক'রল যে, আময় তার মেয়েকে বিয়ে ক'রতে চায় এবং এর জন্য তা'কে তিন হাজার টাকা দিতে রাজী আছে। আময়ের বয়স বড় জোর চল্লিশ—কিন্তু তা'র টাকা পয়সা যথেষ্ট কাজেই মেয়ে খুব সুখেই থাক্‌বে। মেয়ের বাবা এ কথায় খুব খুসী হ'লেন এবং

পুরোহিত দিয়ে একটা শুভদিন দেখাতে গেলেন। কিন্তু ইত্যবসরে শোনা গেল যে, বর একেবারে বুড়ো। একথা শুনে মুক্তা কাঁদতে লাগল, কাজেই তা'র বাবা নিজে গিয়ে সত্যাসত্য নির্ণয় ক'রবেন স্থির ক'রে রওনা হ'লেন। সেখানে গিয়ে দেখেন, গুজব যা শুনেছেন সবই সত্যি।

বর ভাবী শশুরের, মনোভাব বুঝ্তে পেরে তখনই পাঁচশ' টাকা দিয়ে তাঁ'র মুখ বন্ধ ক'রল। মুক্তার বাবাও বাড়ীতে এসে ব'ললেন, ছেলের বয়স মাঝামাঝি ও খুব বড় লোক। এ কথায় মুক্তার মা খুসী হ'তে না পেরে নিজেই ছেলে দেখ্তে গেলেন। আময় এঁকেও কিছু দিয়ে খুসী কর্ল। তিনি যে মনোভাব নিয়ে জামাই দেখ্তে গিয়েছিলেন তা' একেবারে ব'দলে গেল। তিনি মেয়েকে তা'দের প্রকাণ্ড বাড়ী ও প্রচুর টাকাকড়ির কথা বল্তে লাগ্লেন। বিয়ের কথাবার্ত্তা পাকা হ'য়ে গেল এবং পাকা দেখার সময় মেয়েকে দেড় হাজার টাকা দামের হার দিয়ে বরপক্ষ আশীর্ব্বাদ ক'রে গেল।

মুক্তা মনের আনন্দে বিয়ের পোষাক তৈরী কর্তে লাগল; কিন্তু হঠাৎ আর এক প্রতিবেশী ব'লে গেল যে, আময় সত্যিই খুব বুড়ো এবং মুক্তাকে বিয়ে করার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। মুক্তা ত কেঁদেই অস্থির। সে ব'লল যে, এরকম

বিয়ে করার আগে সে আত্মহত্যা ক'রবে। তারপর সে তা'র দুই ভাইকে সত্য ঘটনা জান্‌বার জন্য পাঠাল, কিন্তু তা'রাও ভাবী ভগ্নীপতির কাছে প্রত্যেকে দু'শো টাকা ক'রে জলপানি পেয়ে বোনের কাছে সত্য গোপন ক'রে বর সুশ্রী, বড়লোক প্রভৃতি অনেক কথাই ব'লল। কাজেই মুক্তা আবার আশ্বস্ত হ'য়ে বিয়ের উপকরণ যোগাড়ে মন দিল।

বিয়ের দিন খুব দামী জাঁকজমকশালী পোষাক প'রে একটা সুন্দর চেয়ারে ব'সে মুক্তা বিয়ে ক'রতে গেল। বাড়ীর কেউ সঙ্গে গেল না। কেননা, সত্যকার ব্যাপার জেনে তা'রা কেউ সঙ্গে যেতে সাহস ক'রল না। সেখানে তা'র পরিচিতের মধ্যে রইল ঘটকী। সেই তা'কে টান্‌তে টান্‌তে বিয়ের নির্দ্দিষ্ট যায়গায় নিয়ে গেল। এ সময় যদিও বরকে দেখ্‌বার জন্য মুক্তার মনে খুবই আগ্রহ ছিল তবু প্রথা-অনুযায়ী তা'কে অনিচ্ছা ভাব দেখাতে হ'চ্ছিল।

বিয়ের পর শুভদৃষ্টির সময় যখন মুক্তা দেখ্‌ল যে, আময় সত্যিই খুব বুড়ো এবং প্রতিবেশীদের কথাই সত্যি তখন সে উচ্চৈস্বরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল এবং কোন সান্ত্বনাই মান্‌তে চাইল না। আময় অনন্যোপায় হ'য়ে ঘর থেকে টাকা এনে মুঠো মুঠো ক'রে ছড়াতে ছড়াতে বল্‌তে লাগ্‌ল যে, যখন সে ভালবাসাই লাভ ক'রতে পার্‌ল না

তখন তা'র টাকার কোন দরকার নেই। চারিদিকে টাকা ছড়াতে দেখে মুক্তা পা দিয়ে দু'একটা সরিয়ে নিজের পোষাকের নীচে নিতে লাগ্‌ল, এ ব্যাপার চতুর আময়ের দৃষ্টি এড়ায়নি। সে চুপে চুপে মুক্তাকে ব'লল যে, তা'র প্রচুর টাকা আছে ও সে সবই মুক্তার, সে যত ইচ্ছে নিতে পারে, তাই শুনে মুক্তা তখনকার মত স্থির হ'ল।

এরপরই আময় টাকা দিয়ে কয়েকটি বয়স্ক ছেলে কিনে তা'দের বিয়ে দিল; মুক্তা তখন শাশুড়ী হ'ল এবং পুত্র ও পুত্রবধূদের কাছ থেকে সমস্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা পেয়ে খুব সুখী হ'ল। ক্রমে নাতি-নাত্‌নী নিয়ে সে মহাসুখে সংসার ক'রতে লাগ্‌ল। টাকার জোরে সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও সে এত সুখের অধিকারিণী হ'তে পার্‌ল এবং অনেক চীনাই এরকম সুখ পরম কাম্য ব'লে বিবেচনা করে।

এবার তোমাদের আর একটা গল্প ব'লব। মেঘের উপর এক রাজ্য আছে, যেখানে দেবতারা বাস করেন, সেখানে চীনাদের এক দেবতা ছিলেন তাঁর নাম ফো। একদিন তাঁ'র ভারী ইচ্ছে হ'ল যে, পৃথিবীতে এসে এখানকার লোকেরা কে কি করে, কা'র কেমন স্বভাব এই সব পরীক্ষা ক'রবেন। ইচ্ছা হ'লে দেবতাদের

তা' পূর্ণ ক'রতে আদৌ দেরী হয় না; তখনই তিনি মেঘের উপর চ'ড়ে রওনা হ'লেন এবং পৃথিবীতে নেমে এক বুড়ো ভিখিরীর ছদ্মবেশে কুঁজো হ'য়ে লাঠি ভর দিয়ে কোন রকমে চ'লতে লাগ্‌লেন।

বাইরে তখন বেশ কন্‌কনে শীত। ছেঁড়া জামা গায়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে ফো একটা বাড়ীর দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিলেন। এক বুড়ী এসে দরজা খুলে দিলে তিনি নিজের বিপন্ন অবস্থার কথা ব'লে রাত্রের মত একটু আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। বুড়ীর অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না, দরজীর কাজ ক'রে কোন রকমে দিন চ'লত। কিন্তু অতিথির অবস্থা দেখে তা'র মনে দয়া হ'ল এবং তখনই তাঁকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে আগুনের পাশে ব'সবার যায়গা ও তা'র সাধ্যমত খাওয়ার সুব্যবস্থা ক'রে দিল। অতিথির গায়ের শতছিদ্র জামা দেখে সেই রাত্রেই তা'র জন্য একটা নূতন কোট তৈরী ক'রতে আরম্ভ ক'রল, কিন্তু সারারাত জেগে কাজ ক'রেও শেষ ক'রতে পারল না; কাজেই সকালে সে অতিথিকে আর একবেলা থাক্‌বার জন্য অনুরোধ ক'রল।

যথাসময়ে অতিথির আহার ও বিশ্রামের পর বুড়ী তা'কে কোট তৈরী ক'রে দিল। ফো তা'কে বহু ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিলেন।

ফো বুড়ীর ব্যবহারে খুব খুসী হ'য়েছিলেন তাই যাওয়ার সময় বুড়ীকে বল্‌লেন, "আমি চ'লে যাওয়ার পর যে কাজ তুমি প্রথম আরম্ভ ক'রবে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত তোমাকে তাই করতে হ'বে"।

অতিথিকে বিদায় দিয়ে বুড়ী ঘরে ফিরে গেল এবং অতিথির কোট তৈরী ক'রে কতটা কাপড় আছে দেখ্‌বার জন্য মাপ্‌তে বস্‌ল। যত মাপে কাপড় আর শেষ হয় না, সমস্ত ঘর কাপড়ে ভর্ত্তি হ'য়ে গেল তবু কাপড় শেষ হয় না। ঠিক সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ীর কাপড় মাপা শেষ হ'ল। অত কাপড় দেখে তা'র আনন্দ আর ধরে না, প্রতিবেশী এক বুড়ীকে ডেকে সে সমস্ত ঘটনা ব'ল্‌ল এবং ঐ কাপড় বেচে তার দুঃখ ঘুচ্‌বে ব'লে আনন্দ ক'রতে লাগ্‌ল।

ঘটনা শুনে এ বুড়ীর কিন্তু বেশ হিংসা হ'ল। সে ভাব্‌ল, "এমন সোজা উপায়ে যদি বড়লোক হওয়া যায় তবে আমিই বা এ সুযোগ ছাড়ি কেন ?" এই মনে ক'রে সে সেইদিন থেকে সেই বুড়ো ভিখিরীর সন্ধানে রইল।

কয়েক দিন বাদে ফো আবার ভিখিরীর ছদ্মবেশে প্রতিবেশিনী বুড়ীর দরজায় গিয়ে ঘা দিয়ে একটু আশ্রয় প্রার্থনা ক'রল। বুড়ী তা'কে ভিতরে নিয়ে গিয়ে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ক'রল বটে কিন্তু আগের বুড়ীর মত সব

চেয়ে ভাল খাবার না দিয়ে কতকগুলো আধপোড়া রুটি দিল। গায়ের ছেঁড়া কোট দেখে সে সেটা সেলাই ক'রে দিতে চাইল কারণ তা'র মতে—নূতনের জন্য বেশী খরচ না করাই ভাল। রাত্রে ফোর শোওয়ার জন্য একটা কাঠের মাদুর ছাড়া আর কিছুই দিল না এবং সকালে বিদায়ের আগে ঘরে খাবার থাকা সত্ত্বেও কোন জলযোগেরই ব্যবস্থা ক'রল না। বাধ্য হ'য়ে ফোকে পেটে খিদে নিয়েই রওনা হ'তে হ'ল।

এ সব সত্ত্বেও ফো যাওয়ার আগে ব'লে গেলেন যে, তাঁ'র যাওয়ার পর বুড়ী প্রথম যে কাজ আরম্ভ ক'রবে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত তা'কে তাই ক'রতে হবে। বুড়ী একথা শুনে খুব খুসী। সে ভাব্‌ল সে কত চালাক, কত অল্প খরচ ক'রে এবার সে কত বড়লোক হবে। এই ভেবে সে গজ খুঁজ্‌তে গেল, যাতে তা'র প্রতিবেশীনীর মত কাপড় মেপে প্রচুর কাপড় পেতে পারে কিন্তু পাশেই শূকরের ছানার ডাক শুনে সে বিরক্ত হ'য়ে বল্‌তে লাগ্‌ল, "শূকরের বাচ্ছাটা ভারী বিরক্ত ক'রল ত? যা'ক্ ওকে একটু জল খাইয়ে একেবারে গজ নিয়ে কাপড় মাপ্‌তে বস্‌ব।"

এই ব'লে বাল্‌তি নিয়ে জল তুল্‌তে আরম্ভ ক'রল। কিন্তু এক বাল্‌তি তোল্‌বার পরই দেখে যে সে আর

থামতে পারে না। অনবরত জলই তুল্‌ছে, তা'র জলের পাত্র ভর্ত্তি হ'য়ে ক্রমে সমস্ত বাড়ী জলে ডুবে গেল এবং পাশের বাড়ী ও রাস্তা জলে ভর্ত্তি হ'য়ে গেল। প্রতিবেশীরা তা'কে প্রথমে বারণ ক'রল এবং শেষে রাগারাগি ও ঝগড়া ক'রেও কোন ফল হ'ল না দেখে বাধ্য হ'য়ে পুলিশে খবর দিল।

পুলিশ এসে তা'কে জল তোলা বন্ধ ক'রতে বলায় সে ব'ল্‌ল যে, তা'র বন্ধ করার ক্ষমতা নেই সে নিজে এত ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছে যে জল তোলা বন্ধ ক'রতে পার্‌লেই সে খুসী হ'ত।

পুলিশ এ কথায় বিশ্বাস ক'রল না, ধমক দিয়ে ব'লল, "তুমি ইচ্ছা ক'রলেই বন্ধ করতে পার, কেবল দুষ্টুমি ক'রে করছ না।" ঠিক এই সময় সূর্য্যাস্ত হওয়ায় তা'র জল তোলা বন্ধ হ'ল। পুলিশেরও দৃঢ় ধারণা হ'ল যে, এতক্ষণ দুষ্টুমি ক'রেই সে জল তুল্‌ছিল।

পুলিশ বুড়ীকে ধ'রে নিয়ে গেল এবং বিচারে তা'র এক মাস জেল হ'ল, জেলের বাইরে এসে বুড়ীর শিক্ষা হ'ল যে, অতিরিক্ত লোভ করা ও নীচতা প্রকাশ করার পরিণাম কখনও ভাল হয় না।

চীনের আশ্চর্য্য

চীনে আশ্চর্য্যজনক দু'টো জিনিষ আছে যা'র জন্য সারা বিশ্বে তা'র খ্যাতি। তা'র মধ্যে একটা চীনের প্রাচীর। তোমাদের মধ্যে বোধ হয় এমন কেউ নেই যে চীনের প্রাচীরের কথা শোননি; পৃথিবীতে যে আটটা আশ্চর্য্য জিনিষ আছে চীনের প্রাচীর তা'র মধ্যে একটি। রোম-বাসীরা এক সময় টাইন ও সলওয়ের মধ্যে প্রাচীর দিয়ে ইংলণ্ডকে নিরাপদ রাখার চেষ্টা ক'রেছিল।

কিন্তু তা'র প্রায় তিনশ' বছর আগে চীন সম্রাট শি এই প্রাচীরের কল্পনা ক'রেছিলেন। রোমকদের প্রথম প্রাচীর প্রায় ষাট সত্তর মাইল লম্বা ছিল কিন্তু শির কল্পিত এই প্রাচীর প্রায় পনের শ' মাইল লম্বা। অধিকাংশ যায়গাতেই পর্ব্বতের উপর দিয়ে এই প্রাচীর গাঁথা হ'য়েছে। ইহা পনের থেকে ত্রিশ ফিট পর্য্যন্ত উঁচু এবং অনুরূপ চওড়া, মাঝে মাঝে এক একটা গুম্বজ আছে। দূর থেকে দেখ্‌লে মনে হয়, যেন কতকগুলো কুটীর সারি দিয়া সাজান, আর তা'রই মাঝে মাঝে এক একটা বড় বাড়ী। একজন লোক যদি রোজ সমস্ত দিন হাঁটে তা' হ'লে তা'র প্রাচীরের সমস্তটা ঘুরে আসতে দু'মাস সময় লাগ্‌বে।

কেউ কেউ হিসেব ক'রে বলেন যে, যে মালমসলা দিয়ে ঐ প্রাচীর তৈরী হ'য়েছে তা' দিয়ে দু'ফিট উঁচু ও দু'ফিট চওড়া দু'টো দেওয়াল তৈরী ক'রে পৃথিবীকে বেষ্টন করা যায়। এটা তৈরীর সময় অনেককে জোর ক'রে কাজ করান হ'য়েছে এবং এটা তৈরী করতে অনেকেই মরণকে বরণ করতে বাধ্য হ'য়েছে। এজন্য চীনারা বলে যে, একটা বংশের সমাধির উপর এই প্রাচীর তৈরী। তাতারদের আক্রমণ থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্য এই প্রাচীরের ব্যবস্থা কিন্তু এক হাজার বছর পরে সেই তাতারেরাই চীনদেশ জয় ক'রে রাজ্য শাসন করে।

চীনের দ্বিতীয় আশ্চর্য্য এখানকার প্রকাণ্ড খাল। তাতার সম্রাট্ 'কুবলাই খাঁ' এই খাল কাটান। এটা প্রায় আটশ' মাইল লম্বা এবং চীনের প্রাচীরের মতই আশ্চর্য্যজনক অথচ তা'র চেয়ে অনেক বেশী হিতকারী। মাঝিরা অনেক সময় নৌকায় দক্ষিণ চীনের মাঠ থেকে শস্য সংগ্রহ ক'রে উত্তর দিকে বেচ্‌তে আস্‌ত; প্রায় দু'শ বছর ধ'রে তা'রা এই ভাবে উত্তর থেকে দক্ষিণে, চা'ল ও চা নিয়ে যেত, এখন অবশ্য ক্যাণ্টন্ থেকে পিকিং পর্য্যন্ত রেলপথ হওয়ায় এসব বিষয়ে অনেকটা সুবিধা হ'য়েছে।

চীনের আর একটা আশ্চর্য্যের কথা ব'লে আমরা শেষ কর্‌ব। সেকালে প্রত্যেক প্রদেশের প্রধান সহরে একটা ক'রে পরীক্ষাগৃহ থাকৃত। কিন্তু পরীক্ষাগৃহ ব'ললে কথাটা ঠিক পরিষ্কার হয় না। লম্বা একটা দালানের মধ্যে একজনের বসার উপযোগী ছোট ছোট খোপ করা থাকৃত। প্রত্যেক ছেলেকে সেই খোপের মধ্যে ব'সে প্রশ্নের উত্তর লিখ্‌তে হ'ত। সে সময় খুব সম্ভব নানকিংয়ে সব চেয়ে বড় পরীক্ষাগৃহ ছিল।

প্রত্যেক তিন বছর অন্তর একবার ক'রে বেলা তিনটার সময় প্রায় পনের হাজার ছেলে খাবার ও একটা ক'রে বাতি নিয়ে দু'দিনের মত পরীক্ষা দিতে ব'সত। বাইরে দারুণ উত্তাপ এবং ভেতরে সেই অল্প যায়গার মধ্যে ব'সে না ঘুম, না খাওয়া—তারপর লেখার কষ্টতে অনেকেই অসুস্থ হ'য়ে প'ড়ত। এই কষ্টে কা'রও কা'রও মাথা খারাপ হ'য়ে যেত এবং সময়ে সময়ে কেউ বা কলম হাতেই মরণকে বরণ ক'রতে বাধ্য হ'ত। এখন অবশ্য এ ধরণের পরীক্ষার নিয়ম আর নেই। অনেক যায়গায় এই সব পরীক্ষাগৃহ ভেঙ্গে সেখানে অন্য বাড়ী তৈরী হ'য়েছে। ফুচুতে পূর্ব্বের পরীক্ষাগৃহ ভেঙ্গে সেখানে পার্লিয়ামেণ্ট সভার গৃহ নির্ম্মাণ করা হ'য়েছে।

ধর্ম্মগুরু ও ধর্ম্ম

এতক্ষণ দেশ সম্বন্ধে বলা হ'ল। এইবার এদেশের আদি ধর্ম্মগুরু যিনি দেশকে প্রকৃত উন্নতির পথে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁ'র সম্বন্ধে কিছু ব'লব। এঁর নাম ছিল 'কনফুসিয়াস্'। যীশুখৃষ্টের জন্মের প্রায় পাঁচশ' বছর আগে ইঁনি জন্মেছিলেন। এঁর পিতা ছিলেন একজন নির্ভীক সেনাপতি। কনফুসিয়াসের বয়স যখন দশ বছর তখন তাঁ'র পিতার মৃত্যু হয়।

ছোটবেলা থেকেই অতীতের ঘটনা পাঠের প্রতি তাঁ'র বিশেষ অনুরাগ ছিল। উনিশ বছর বয়সে তাঁ'র বিয়ে হয় এবং বাইশ বছর বয়সে তাঁ'র মা মারা যান। তখন তিনি গবর্ণমেণ্টের অধীনে চাক্‌রী ক'রতেন; সে সময়কার ওদেশের রীতি অনুসারে তাঁ'কে তিন বছর মার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ ক'রতে হ'য়েছিল ব'লে ঐ সময় চাক্‌রী ছেড়ে দিয়ে তিনি গৃহে পড়াশুনা আরম্ভ করেন। এর পর ক্রমশঃ তিনি তাঁ'র মত প্রচার ক'রতে লাগ্‌লেন এবং অনেক শিষ্যও হ'ল; সদালাপ ও সদ্ব্যবহারের দিকে তাঁ'র বিশেষ দৃষ্টি ছিল।

পঞ্চাশ বছর বয়সে তিনি একটা নগরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন এবং তাঁর শাসনের গুণে সমস্ত দেশে অল্পদিনের মধ্যেই শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়। সাধারণ লোকে তাঁ'কে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ক'রত, সত্তর বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁ'র কবরের উপর প্রত্যেক বছর তাঁ'র মৃত্যুদিন স্মরণ ক'রে চীনারা একমুঠো ক'রে মাটি দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেয়। তাঁর কবরটা একটা ছোট্ট পাহাড়ের মত হ'য়েছে।

কি ক'রে সৎ, নম্র, ভদ্র, অধ্যবসায়ী ও অধ্যয়নশীল হ'তে হয় তা' তিনি দেশবাসীকে নিজের দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। আজ প্রায় দু'হাজার চারশ' বছর ধ'রে তাঁ'র শিক্ষা চীনাদের উপর প্রভাব বিস্তার ক'রে আস্‌ছে। যতদিন পৃথিবীতে একজন চীনাও বেঁচে থাক্‌বে ততদিন কনফুসিয়াসের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ ক'রবে।

ধর্ম্মগুরুর উপর প্রগাঢ় ভক্তি থাক্‌লেও ধর্ম্মের উপর চীনাদের বিশেষ আস্থা নেই। তা'রা ভয়ানক কুসংস্কারাচ্ছন্ন। শুভদিন, শুভ চিহ্ন, শুভ রং প্রভৃতি তা'রা খুব মেনে চলে। কোন শুভকাজ ঠিক করার সময় যদি হঠাৎ হাত থেকে কোন জিনিষ প'ড়ে যায় বা ভেঙ্গে যায় তা' হ'লে সে কাজে আর তা'রা এগুবেনা কেননা প'ড়ে যাওয়া বা ভেঙ্গে যাওয়া তাদের কাছে একটা অশুভ চিহ্ন।

এক সময় ক্যান্টনের একটা গির্জ্জায় লাল রং করা হয়, আগুনের মত রং ব'লে সকলের ধারণা হ'ল যে গির্জ্জায় ওরকম রং থাক্‌লে হয়ত সহরে আগুন লাগ্‌তে পারে। তৎক্ষণাৎ নাগরিকেরা কর্ত্তৃপক্ষের কাছে একথা জানিয়ে নিজেদের খরচে ঐ গির্জ্জার লাল রং বদ্‌লে অন্য রং করিয়ে দিল।

প্রকৃতপক্ষে চীনদেশে তিন রকমের ধর্ম্ম আছে। এক দল বৌদ্ধ মত পালন করে, একদল ট্যাও মত ও একদল কনফুসিয়াসের মতাবলম্বী। এখানে অধিকাংশ মন্দির বৌদ্ধ, অনেক স্কুলে কনফুসিয়াসের পূজা করে এবং লোকে যখন বিপদে পড়ে বা নিজেদের ভাগ্য সম্বন্ধে কিছু জান্‌তে চায় তখন ট্যাও ধর্ম্মাবলম্বীদের ডাকে।

এখানকার তথাকথিত শিক্ষিত লোক পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস করে না এবং অনেক সময় পৌত্তলিক দেবতার প্রতি কোন রকম সম্মান দেখায় না। তা'দের মতে এ সব অশিক্ষিতের দেবতা। হয়ত যেবার সুবৃষ্টি হ'ল এই শিক্ষিতেরাই দল বেঁধে এই সব দেবতার প্রতি সম্মান দেখানর জন্য বেরিয়ে প'ড়ল আবার অনাবৃষ্টি হ'লে দেবতাকে মন্দির থেকে বাইরে এনে রোদে ফেলে রেখে দিল। তা'ব'লে ধার্ম্মিক লোক যে একেবারে নেই তা'

বলা যায় না। একবার নাকি এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী ঈশ্বরলাভের আশায় নিজের ডা'ন হাত কেটে ঈশ্বরকে উপহার দিয়েছিলেন।

এই সব পৌত্তলিক দেবতার চেয়ে তা'রা কাষ্ঠের ফলকে নিজেদের পূর্ব্বপুরুষের মূর্ত্তি অনেক বেশী যত্ন ও শ্রদ্ধার সঙ্গে রক্ষা করে। বাড়ীর সব চেয়ে ভাল ঘরটিতে মৃত আত্মীয়-স্বজনের মূর্ত্তি সারি দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয় এবং নীচে প্রত্যেকের নাম লিখে রাখে। প্রত্যেক মূর্ত্তির সাম্‌নে একটা ক'রে কাঠি থাকে তাঁ'দের জীবিতের মত মনে ক'রে, খাওয়ার ব্যবস্থার জন্য।

কোন বড়লোক মারা গেলে প্রেতলোকে তাঁ'র কি দরকার হবে না হবে এই বিবেচনা ক'রে তাঁ'র ছেলেরা প্রত্যেক জিনিষের নমুনা নিয়ে পুড়িয়ে দেয়, পোষাক-পরিচ্ছদ, চাকর-বাকর আসবাবপত্র প্রভৃতি কাঠের বা কাগজের তৈরী ক'রে অনেকগুলো কাগজের তৈরী টাকার সঙ্গে একসঙ্গে পুড়িয়ে দেয়। এদের বিশ্বাস এগুলো পরলোকে মৃত ব্যক্তিরা ভোগ ক'রবে। গরীব হ'লে তা'র বেশী খরচ করার ক্ষমতা থাকে না, তবু অল্প পয়সায় কিছু কিছু কোট, জুতা, টুপি প্রভৃতির ছবি কিনে পুড়িয়ে দেয়।

চীনা ছেলেরা এপ্রিল মাসে একটা উৎসব করে। ঐদিন

তা'রা তা'দের মা, বাবা, ভাই, বোন ও আত্মীয়-স্বজন সঙ্গে ক'রে তা'দের পূর্ব্বপুরুষদের কবরের কাছে যায়। সেখানে বেশ পরিষ্কার ক'রে নানারকম খাবার জিনিষ সাজিয়ে দেয় এবং যখন মনে করে যে, পূর্ব্বপুরুষদের প্রেতাত্মারা এসে সেই সব খেয়েছেন তখন নিজেরা তাঁ'দের প্রসাদ মনে ক'রে মহা আনন্দে সেই সব খাবার খায়। কবরের চারিদিকে কাগজের তৈরী টাকা ছড়িয়ে রেখে আসে।

পূর্ব্বে যে তিন রকমের ধর্ম্মের কথা বলেছি তা' ছাড়াও মুসলমান বা খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বীও দেখা যায়। এখানে গরীবদের জন্য অনাথ আশ্রম আছে। অনেক সময় পুলিশ রাস্তা থেকে ভিখারী বা অন্ধ ছেলেমেয়ে ধ'রে আশ্রমে নিয়ে আসে ও তা'দের খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দেয়। চীনারা অন্য জিনিষে যত অপমান বোধ করুক আর নাই করুক বিদেশে মৃত্যুকে তা'রা চরম অপমানের বিষয় ব'লে জ্ঞান করে। এটা তাদের স্বদেশ প্রীতির একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বর্ত্তমান চীন

এতক্ষণ অতীত ও মধ্যযুগের চীন সম্বন্ধে বলা হ'ল, এবার বর্ত্তমান চীন সম্বন্ধে কিছু ব'লে এ প্রসঙ্গ শেষ করব। ১৯১১ সালে চীনে এক বিদ্রোহ হয় এবং তা'র ফলে রাজা সিংহাসন ত্যাগ করেন। এই বিদ্রোহের স্বষ্টিকর্ত্তা ছিলেন সান্‌ইয়াৎসেন। তিনি দক্ষিণ চীনে জন্মগ্রহণ করেন। পরে তাঁর বাপ, মা সিঙ্গাপুর গিয়ে বাস করতে থাকেন। তিনি ছোটবেলায় মিশনারী স্কুলে প'ড়তেন এবং খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। হংকং বিশ্ববিত্থালয় থেকে তিনিই সর্ব্বপ্রথম ডাক্তারীতে উপাধি লাভ ক'রে নিজ গ্রামে চিকিৎসা আরম্ভ করেন। কিন্তু ঐ সময় দেশের লোকের উপর মাঞ্চু গবর্ণমেণ্টের অযথা অত্যাচার দেখে তিনি গ্রামে আবদ্ধ হ'য়ে থাক্‌তে পার্‌লেন না, দেশের কয়েকজন যুবককে সঙ্গী ক'রে নিয়ে তিনি মাঞ্চু রাজের বিরুদ্ধে গুপ্ত সমিতি গঠন ক'রে দেশের মধ্যে স্বাধীনতার বীজ ছড়াতে লাগ্‌লেন। [illegible] তিনি এইভাবে প্রচারকার্য্য চালা[illegible] এর জন্য অনেকবে[illegible] অনেক রকম কষ্ট সহ্য ক'র[illegible] হ'[illegible]ছে।

এক সময় তাঁ'কে ধ'রে দিতে পার্‌লে ছ'হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে ব'লে মাঞ্চুরাজ ঘোষণা করেন। এক-দিন যখন তিনি একা জাহাজে যাচ্ছেন হঠাৎ একজন লোক ঐ পুরস্কারের লোভে তাঁকে ধ'রে দেওয়ার জন্য তাঁ'র

কাছে এল। কিন্তু তাঁ'র সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর সে করজোড়ে তার দুরভিসন্ধির কথা জানিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করল। সান্‌ইয়াৎসেনের এমন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিল

যে, যে কোন লোক তাঁ'র সঙ্গে একবার পরিচিত হ'লে তাঁ'র সরলতা ও সহৃদয়তার কথা কখন ভুলতে পারত না।

কি অসামান্য নিপুণতা ও শৃঙ্খলার সঙ্গে তিনি বিদ্রোহীদের পরিচালিত ক'রতেন। সহরে সংবাদপত্র ছাপিয়ে দেওয়ালে মেরে দেওয়া হ'ত। কয়েকজন ক'রে লোক এক যায়গায় একত্রিত হ'লে একজন চেঁচিয়ে প'ড়ে সকলকে সংবাদ জানিয়ে দিত।

মাথায় লম্বা চুল বিনুনি ক'রে রাখা মাঞ্চুরাজের সময় প্রথম প্রচলিত হয়। যা'দের এই বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতি ছিল তা'রা এই বেণী কেটে ফেল্‌ল। সানের নূতন নিয়মে তিনি মেয়েদের পা বাঁধা বন্ধ ক'রে দিলেন। এঁর চেষ্টায় দেশে ভাল রাস্তা ও যান চলাচলের সুবন্দোবস্ত হ'ল। ইনি চীনা ভাষারও যথেষ্ট সংস্কার করেন। আগে চীনা ভাষায় কোন অক্ষর ছিল না, এক একটা ছবি এক একরকম অর্থ প্রকাশ ক'রত। এ রকম সাধারণ অক্ষরের সংখ্যা ছিল প্রায় চা'র হাজার, কিন্তু 'সান্' উনচল্লিশটি অক্ষর সৃষ্টি ক'রে অনেক সুবিধা ক'রে দিয়েছেন।

শাসনভার গণতন্ত্রের অধীনে আসায় এঁরা আফিংয়ের চাষ বা আফিং বিক্রয় একেবারে বন্ধ ক'রে দেন। কিন্তু

দুঃখের বিষয় যে, আফিংয়ের চেয়েও ক্ষতিকর ওষুধ চীনারা গুপ্তভাবে আমদানি করে।

১৯১১ সাল থেকে আজ পর্য্যন্ত সানের চেষ্টায় চীনের বহু উন্নতি সাধিত হ'য়েছে। তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল চীনাদিগকে সুখী ও সমৃদ্ধ দেখে যাওয়া। সে ইচ্ছা অনেকটা পূর্ণ হ'য়েছে। ১৯২৬ সালে তাঁ'র মৃত্যু হয়। চীনারা তাঁর স্মৃতিস্তম্ভের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ ক'রেছে। দেশবাসী আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁ'র স্মৃতি তর্পণ করে। তাঁ'র জাতীয়তা, গণতন্ত্র ও সামাজিক উন্নতি সম্বন্ধে বক্তৃতা চীনের প্রত্যেক স্কুলে অবশ্য পাঠ্য ব'লে গবর্ণমেণ্ট আদেশ দিয়েছেন। তিনি রেখে গেছেন তাঁ'র দেশভক্তির উজ্জ্বল আদর্শ এবং তাঁ'র অসমাপ্ত কাজ শেষ ক'রবার জন্য একদল নির্ভীক, উদার, দেশভক্ত যুবক।

জাপান

জাপান সম্বন্ধে তোমরা সকলে বিশেষ কিছু না জান্‌লেও অনেকেই জাপানী জিনিষের সঙ্গে পরিচিত। জাপানী শিল্প, জাপানী খেল্‌না, জাপানী সাইকেল, জাপানী কলম প্রভৃতি তোমরা অনেকেই ব্যবহার ক'রে থাক্‌বে। এ দেশের প্রত্যেক জিনিষের বাইরের সৌন্দর্য্য ও সস্তা দামের জন্য অতি অল্প দিনের মধ্যেই সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে প'ড়েছে, আজকাল এমন খুব কম জিনিষই আছে যা' জাপান তৈরী কর্‌ছে না। ইংরাজীতে জাপান (Japan) শব্দটির ধাতুগত অর্থ ক'রলে এই রকম দাঁড়ায়। Jih—sun (সূর্য্য) pun—origin (উৎপত্তি) অর্থাৎ সূর্য্য থেকে যার উৎপত্তি। এইজন্য জাপানকে Land of the Rising sun বা উদীয়মান সূর্য্যের দেশ বলা হয়। জাপানের জাতীয় পতাকায়ও উদীয়মান সূর্য্যের ছবি আঁকা আছে।

জাপানের উৎপত্তি সম্বন্ধে ওদেশে কয়েক রকম মত প্রচলিত আছে। কেউ বলেন একদিন ইসানাগী ও ইসানামী (ও দেশের দেবদেবী) স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে

বেড়াতে আসেন। অনেক রত্ন বসান একখানা লাঠি ছিল তাঁদের হাতে, তাই দিয়ে সমুদ্রের জল নাড়্‌তে থাকেন এবং সেই লাঠির মুখ থেকে যে সমুদ্রের ফেনা পড়ে তা'তেই সৃষ্টি হ'ল একটা ক্ষুদ্র দ্বীপ,—সেই হচ্ছে আজকার জাপান।

আবার কেউ বলেন, এই দেবদেবীরা যোদ্ধা ছিলেন। সঙ্গে তাঁ'দের অনেক অনুচর ছিল। তাদেরই সাহায্যে এই দ্বীপের অধিবাসীদের আক্রমণ ক'রে তাদের বিতাড়িত করেন। এঁদের সঙ্গে ছিলেন জিমু। জিমুই হচ্ছেন জাপান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ও জাপানের প্রথম সম্রাট। যীশুখৃষ্টের জন্মের ৬৬০ বছর আগে এই ঘটনা ঘটে।

চীনের তুলনায় জাপান সাম্রাজের সৃষ্টি হ'য়েছে অনেক পরে। চীনারাই জাপান্ জয় ক'রে সেখানকার অধিবাসীদের শিক্ষা ও সভ্যতার আলোকের সন্ধান দেয়। বেশী দিনের কথা নয় আমাদের দেশের কবি দ্বিজেন্দ্রলালই গেয়েছিলেন,—

চীন ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে করে হেয়জ্ঞান
ভারত শুধুই ঘুমিয়ে রয়।

জাপান সাগর
শিকক
কিউশু
ফরমোসা
জাপান সাম্রাজ্য
0 ১০০ ২০০ ৩০০ ৪০০
১২০ ১৩০ ১৪০

কিন্তু আজ আর জাপান সম্পর্কে সে কথা খাটে না। চীন তাকে সভ্যতা বা শিক্ষার পথ দেখিয়ে দিল, কিন্তু জাপান নিজ অধ্যবসায় গুণে আজ চীন থেকে অনেক বেশী উন্নতি ক'রেছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বেশী উন্নতি ক'রে জগতকে স্তম্ভিত ক'রতে এর আগে বোধ হয় আর কোন জাত পারেনি, তাই দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার "অসভ্য জাপান" পরিবর্ত্তন ক'রে বাধ্য হ'য়ে আজ "নবীন জাপান" লিখ্‌তে হ'য়েছে।

সত্যিই জাপান একটা সুন্দর দেশ, বড় বড় পাহাড় মাথা খাড়া ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তারই গা বেয়ে স্রোতস্বিনীর ধারা নাচ্‌তে নাচ্‌তে সমতল ভূমির উপর দিয়ে ব'য়ে চলেছে। পাহাড়ের পাদদেশে স্রোতস্বিনীর ধারায় পুষ্ট উপত্যকা। প্রভাতের দৃশ্য কি মনোরম! গিরিশৃঙ্গে তুষারের উপর প্রভাত সূর্য্যের কিরণ পাতে এক অপূর্ব্ব দৃশ্যের সৃষ্টি হয়।

মানুষ মাত্রই সুন্দরের উপাসক, তাই জাপানীরা পর্ব্বত পূজা করে, এবং প্রতি বৎসর ফুজিসান (জাপানের শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত) পূজা উপলক্ষে একটা নির্দ্দিষ্ট দিন স্থির করা থাকে। জাপানে পর্ব্বত বেশী ব'লেই সমতল ভূমি খুব কম। তাই এখানে খুব কম

শস্য জন্মায়, জাপানের মাটি অধিবাসীদের অন্নের সংস্থান ক'র্‌তে পারে না ব'লেই তারা জীবিকার জন্য কলকারখানা সৃষ্টি করেছে।

জাপানে পর্ব্বত যেমন অনেক পরিমাণে একে সুন্দর ক'রেছে তেমনি অনেক দুঃখেরও সৃষ্টি করে।

আগ্নেয়গিরির মুখ

অধিকাংশ পর্ব্বতই আগ্নেয়গিরি তাই জাপানে প্রায়ই ভূমিকম্প হয় ও মাঝে মাঝে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে দেশবাসীর বহু ক্ষতি করে। ১৮৭১ সালের ভূমিকম্পে দশ হাজার লোক হত, বিশ হাজার আহত এবং এক লক্ষ

ত্রিশ হাজার বাড়ী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ১৯২৩ সালে যে ভূমিকম্প হয় তার ফল এর চেয়েও ভীষণ।

কৃষিজাত ফসলের মধ্যে জাপানে ধানই প্রধান, কিন্তু লোকের জমি খুব কম। যার দশ একর জমি আছে, সে বেশ বড় লোক, ধান জন্মাতে এখানে খুব পরিশ্রমের দরকার। এখানে ঘোড়া বা গরুর সাহায্যে লাঙ্গলে খুব বেশী চাষ করা যায় না, অধিকাংশ জমি কোদাল দিয়ে কাট্‌তে হয়। ধানের জমিতে প্রচুর জলের দরকার, তাই নিকটবর্ত্তী নদী বা খাল থেকে জল এনে জমি ডুবিয়ে রাখা হয়। বেশ একটু কাদা হ'লে ধানের চারা পুঁতে দিতে হয়। যখন ধান পাকে তখন জমির জল সরিয়ে দেয়। ও দেশের জমির খুব দাম বেশী। তা'ই আমাদের দেশের মত আ'ল (আইল) দিয়ে জমি নষ্ট করে না, তবু নিজেদের সীমানা ঠিক ক'রতে এদের কোন অসুবিধা হয় না।

ধান কলে দিয়ে চা'ল তৈরী করে। তা'ই এরা চালের পূর্ণ উপকারিতা লাভ ক'রতে পারে না। আমাদের দেশেও বিলাসিতাকে অনুসরণ ক'রতে গিয়ে সহরে কলে ছাটা চা'ল খাওয়া আরম্ভ হ'য়েছে, তা'র ফলে ওদেশের বেরি-বেরি রোগ আমাদের দেশবাসীকেও আক্রমণ ক'রতে সুরু

ক'রেছে। জাপানে চা'ল' থেকে এক রকম মদ তৈরী হয়, তা'র নাম সাকে।

এখানে আর একটা প্রধান শস্য হয়, সেই শস্য থেকে কাগজ তৈরী হয়। জাপানী বাণিজ্যে এই কাগজের স্থান অতি উচ্চে। প্রত্যেক যায়গায়, প্রত্যেক কাজে এই কাগজ ব্যবহৃত হয়। জাপানীরা যে ঘরে বাস করে তা'র অধিকাংশ কাগজের তৈরী। তা'রা কাগজের পাত্রে জল খায়, কাগজের আলোতে পড়ে, কাগজের দড়িতে মোট বাঁধে, কাগজের রুমাল ব্যবহার করে, কাগজের টুপি, বৃষ্টিতে কাগজের ছাতা, তা'ছাড়া আরও অনেক কাজে কাগজ ব্যবহার করে। প্রায় ষাট্ রকমের কাগজ এখানে তৈরী হয় এবং প্রত্যেক রকমের কাগজ বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়।

জাপানে চাও খুব বেশী পরিমাণে জন্মায়। পর্ব্বতের ধারেই চা গাছ জন্মে। ধানের মত চারা গাছ তৈরী ক'রতে অত কষ্ট পেতে হয় না। জাপানীরা প্রায় প্রত্যেকেই চা পানে অভ্যস্ত। কিন্তু তারা চার সঙ্গে দুধ বা চিনি মিশিয়ে খায় না। জাপানের উৎপন্ন চা অধিকাংশ আমেরিকায় চালান দেয়।

জাপানে বাড়ীর পিছনে বাঁশ ঝাড় থাকে। আমাদের

চেয়ে ওরা অনেক কাজে বাঁশ ব্যবহার করে। বাঁশ থেকে ঘরের চাল, মাচা, বাক্স, দাঁড়, ছিপ, ফুলদানি, পাখা, ছাতা প্রভৃতি অনেক জিনিষ তৈরী করে, এ ছাড়া কচি বাঁশের শাঁস এরা খুব যত্ন ক'রে খায় এবং খুব পুষ্টিকর বলে বিবেচনা করে।

জাপানের রাস্তায় প্রায়ই তীর্থযাত্রী দেখা যায়—যা'রা হয়ত কোন পবিত্র মন্দির বা অধিকাংশ সময় ফুজিসান পর্ব্বত দেখ্‌তে যায়। ফুজিসানের যাত্রীদের পোষাক দেখেই চেনা যায়। তা'দের পোষাক সমস্ত সাদা ও পায়ে খড়ের জুতো, মাথায় গোল সাদা টুপি ও কাঁধে একটা ক'রে মাদুর, গলায় এক ছড়া ক'রে মালা—অনেকটা আমাদের দেশের রুদ্রাক্ষের মালার মত ও একটা ক'রে ঘণ্টা ঝুলান থাকে। চ'লবার সময় অনবরত এই ঘণ্টার শব্দ শোনা যায়।

জাপানের সাধারণ লোক পুলিশকে বেশ শ্রদ্ধা করে। তা'র একটা কারণ আশি বছর আগে যখন জাপানে শাসক ও শাসিত মাত্র এই দুইটি সম্প্রদায় বর্ত্তমান ছিল, তখন প্রথমোক্ত শ্রেণীতে ছিল 'ডেমি ও' অর্থাৎ জমিদার শ্রেণী। তা'দের প্রধান সহচরদের ব'লত 'সামুরাই'। সেকালে কোন 'ডেমি ও' বেড়াতে বেরোনর সময় গাড়ীর দরজা বন্ধ

ক'রে যেতেন, সঙ্গে রক্ষক হিসাবে সামুরাইরা যেত। এঁদের পথে কোন সাধারণ লোক প'ড়লে হয় তা'কে তৎক্ষণাৎ পথ ছেড়ে একপাশে যেতে হ'ত, নতুবা সামুরাইরা তৎক্ষণাৎ তরবারি বা'র ক'রে তা'দের আঘাত ক'রত। এর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই চ'লত না।

জাপানের প্রাচীন শাসন প্রণালীর যখন পরিবর্ত্তন হ'ল, তখন সামুরাইদের মধ্যে কেউ বা ভৃত্য হ'ল (কেননা জাপানে ভৃত্যের কাজ খুব সম্মানের), কেউ বা মুদ্রাকর হ'ল, আবার কেউ বা পুলিশ হ'ল। আগে সামুরাইদের লোকে বেশ ভয় ক'রত কাজেই এখনও তা'দের ভয় ও শ্রদ্ধা ক'র্‌তে লাগ্‌ল। এরাও এই সময় থেকে জনসাধারণের উপর বেশ শিষ্টাচার করতে আরম্ভ ক'রেছে।

রাস্তায় কনষ্টেবলদের জন্য মাঝে মাঝে একটা ক'রে ছোট কাঠের ঘর থাকে এবং রাত্রে তা'র সাম্‌নে লাল আলো জ্বলে। ঘরের মধ্যে থাকে একটা টেলিফোন, সেই অঞ্চলের একখানা ম্যাপ এবং বাসিন্দার নাম ও ঠিকানা লেখা একখানা বই। পুলিশের কাছে রাস্তা বা বাড়ীর খোঁজ ক'রলে যথাসাধ্য সাহায্য করে; এমনকি সে অঞ্চলে না হ'লে টেলিফোনে খোঁজ নিয়ে ব'লে দেয়।

জাপানী শিশু

জাপানীরা ছেলেমেয়ে খুব ভালবাসে। ছেলের চেয়ে মেয়েকে কম ভালবাস্‌লেও চীনাদের মত মেয়ে বোঝা ব'লে মনে করে না। শিশুর জন্মের ছ'দিন পর তা'র নাম রাখা হয়। সেই উপলক্ষে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়াতে হয়। একুশ দিনে মাতা আঁতুড়ঘর ছাড়েন। শিশুটি পুত্র হ'লে ত্রিশ দিনে ও কন্যা হ'লে একত্রিশ দিনে তা'কে নিয়ে মা মন্দিরে যান। সেখানে দেবতার প্রসাদী 'সাকে' শিশুর কপালে ছুঁইয়ে তা'র মঙ্গল কামনা করা হয়। শিশুর মাতামহী সংবাদ পেয়েই একটি মূল্যবান "কিমানো" (পোষাক) শিশুকে প্রথম উপহার পাঠিয়ে দেন। আমাদের দেশের পার্ব্বত্য স্ত্রীলোকদের মত ওদেশেও ছোট ছেলেমেয়ে পিঠে বেঁধে নিয়ে বেড়ায়। শিশু কন্যার বয়স চা'র পাঁচ বছর হ'লেই তা'কে ছোট ভাই বা বোনকে পিঠে বেঁধে নিয়ে বেড়াতে হয়।

ছোটবেলায় লেখাপড়া শেখার সঙ্গে সঙ্গে তা'দের সামাজিক রীতি-নীতিও শিক্ষা দেওয়া হয়। জাপানী ছেলে-মেয়েরা অত্যন্ত শান্ত, ধীর ও ভদ্র এবং বয়স্ক লোকের মত

ক'র সঙ্গে কি রকম ব্যবহার ক'রতে হবে, ছোটবেলা থেকেই তা'রা তা' শেখে। বয়োজ্যেষ্ঠ, সমবয়স্ক বা অল্প-বয়স্কদের প্রতি সম্মান দেখানর বিভিন্ন নিয়ম। কাজেই কা'কে কি ভাবে বা ক'বার নমস্কার ক'রতে হবে এ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কভাবে তা'দের অভ্যাস ক'রতে হয়।

সম্রাট্ ট্রেণে যাওয়ার সময় ষ্টেশন থেকে তাঁ'কে যদি সম্মান দেখাতে হয় তা'হ'লে এমনভাবে মাথা নীচু ক'রতে হবে, যা'তে তাঁকে দেখার কোন অসুবিধা না হয়, অথচ কোন বিদেশী যদি কোন জাপানী বাড়ীর সাম্‌নে যান তা'হলে ছেলেমেয়েরা হাটু পেতে ব'সে মাটিতে হাত রেখে তাতে কপাল ছোঁয়াবে। এ সমস্ত নিয়ম স্কুলেও শেখান হয়।

সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোক চেনা যায় তাদের কাজ দেখে। কোন মেয়ে যখন কোন অতিথিকে চা দেয়, তখন তা'র দেওয়ার ভঙ্গি লক্ষ্য ক'রলেই বোঝা যাবে কি রকম বংশে তা'র জন্ম। কি ক'রে লোককে আহ্বান ক'রতে হয়, কি ক'রে ঘরে ঢুক্‌তে হয়, কি ক'রে চায়ের ট্রে নিয়ে যেতে হয়, এবং কি ভাবে অতিথিকে দিতে হয় এই সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপার খুব ছোটবেলা থেকে জাপানী ছেলে-মেয়েদের বিশেষ ক'রে শিক্ষা দেওয়া হয়। গৃহকর্ম্মের মধ্যে ফুল সাজাতে শেখা অত্যন্ত দরকারী।

জাপানী ছেলেমেয়েদের পোষাক একই ধরণের। তাদের দেশী পোষাক "কিমোনো"। এটা খুব ঢিলে ব'লে কোমরে কাপড়ের টুক্‌রা দিয়ে বাঁধা থাকে; সেগুলোকে বলে 'ওবি'। বিভিন্ন বয়সের লোক বিভিন্ন ভাবে 'ওবি' বাঁধে। এই বাঁধা দেখে মেয়েদের বিয়ে হ'য়েছে কিনা বোঝা যায়। ছেলেরা সরু 'ওবি' বাঁধে কিন্তু মেয়েদের 'ওবি' চওড়া। পায়ে মোটা সাদা ষ্টকিংয়ের মত এক রকম পরে। বাইরে যাওয়ার সময় ওর উপর জুতো পরে, বাড়ীতে শুধু ঐ পায়ে দিয়ে বেড়িয়ে বেড়ায়। জুতো পায় দিয়ে বাড়ীর ভিতরে বেড়ানর নিয়ম নেই। গ্রামে চামড়ার জুতো খুব কম লোকেই পরে। অধিকাংশ লোকই কাঠের জুতো বা 'ওয়ারাজী' (খড়ের স্যাণ্ডেল) ব্যবহার করে। ছোট্ট মেয়েরা খুব চক্‌চকে 'কিমোনো' পরে এবং তাতে নানা রকমের কাজ করা থাকে, যত কম বয়স থাকে তত বাহারে পোষাক পরে। ছ' বছর বয়স পর্য্যন্ত কোমরে সরু 'ওবি' বাঁধে। কিন্তু সাত বছর থেকে চওড়া 'ওবি' বাঁধতে আরম্ভ করে। বিয়ের আগে তারা নানা রকম ফ্যাসান ও উজ্জ্বল রং ব্যবহার ক'র্‌তে পারে। বিয়ের পর তাদের খুব সংযত ধরণের পোষাক ব্যবহার ক'র্‌তে হয়।

জাপানী ছেলেমেয়ে

জাপানী পরিবারে ছেলেদের আদর বেশী। অন্য কারণ বাদ দিলেও এর ধর্ম্মসঙ্গত কারণ আছে। জাপানী পরিবারে পূর্ব্বপুরুষেরাই গৃহদেবতা। একমাত্র পুরুষ যেমন এই পূজা পাওয়ার অধিকারী, তেমনি পূজা করার অধিকারীও পুরুষ। স্ত্রীলোক যেমন পূজা পান না তেমনি তাঁ'দের পূজা ক'রবারও অধিকার নেই। তা' ছাড়া ছেলেরাই সাধারণতঃ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। এজন্য জাপানী পরিবারে ছেলে হ'লে সকলেই খুব সন্তুষ্ট হয়। অবশ্য মেয়ে হ'লে তার উপর চীনাদের মত দুর্ব্ব্যবহার করে না, তাকেও ছেলেদের মতই আদর যত্ন করে। তবে ধর্ম্ম সংক্রান্ত বা বৈষয়িক ব্যাপারে ছেলের চেয়ে মেয়ের প্রয়োজনীয়তা কম।

প্রত্যেক জাপানী ছেলেকে সর্ব্বাগ্রে পিতামাতা ও সম্রাটের প্রতি কর্ত্তব্য শিক্ষা দেওয়া হয়। অন্য জিনিষের প্রতি কর্ত্তব্যে অবহেলা হ'লেও এগুলোর প্রতি কর্ত্তব্য-পালনে কোন ত্রুটি না হয়, এজন্য খুব ছোটবেলা থেকেই নানা রকম গল্পের ভিতর দিয়ে এ জিনিষটা তাঁ'দের মনে গেঁথে দেওয়া হয়।

আমাদের দেশে যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির মাতৃভক্তি, একলব্যের গুরুভক্তি, ইংরাজীতে ক্যাসাবিয়াঙ্কার পিতৃভক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা রকম গল্প আছে, ওদেশেও সেই রকম ভাল ছেলেমেয়েদের পিতৃ-মাতৃভক্তি সম্বন্ধে অনেক আগের একখানা পুরাণ গল্পের বই আছে। সেই বইয়ে ছাব্বিশটি গল্প আছে। জাপানী ছেলেমেয়েদের এ বই খুব প্রিয়।

একটা গল্পে আছে যে, এক বিমাতা তাঁর ছেলেদের উপর খুব নিষ্ঠুর আচরণ ক'রতেন। মাছ তাঁর খুব প্রিয় ছিল। একদিন খুব ঠাণ্ডা পড়েছে। সাধারণ লোক ইচ্ছে ক'রে বাইরে বেরুতে চায় না। এরই মাঝে তিনি তাঁর বৈমাত্র ছেলেকে পাঠালেন মাছ আন্‌বার জন্য। ছেলে যেয়ে দেখে, শীতে জল জ'মে গেছে, মাছ পাওয়ার কোন আশা নেই। অনেক চেষ্টা ক'রেও সুফল হ'ল না দে'খে, অবশেষে সে খালি গায়ে সেই জল জমা বরফের উপর শুয়ে প'ড়ল, তার গায়ের উত্তাপে একটু বরফ গ'লে যেতে সেখান থেকে দুটো কার্প মাছ (carp) নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য বেরুল। সেও সেই অবসরে তাদের ধ'রে নিয়ে এল।

আর একটা ছোট্ট ছেলে তার নিজের মশারী থাক্‌লেও মা, বাপের মশারী ছিল না ব'লে নিজে মশারীর বাইরে

শুয়ে থাক্‌ত, যাতে মশা তা'কেই কামড়ায় এবং তার মা, বাবা ভালভাবে ঘুমুতে পারেন।

জাপানীরা সম্রাটের প্রতি কর্ত্তব্যকে দেশের প্রতি কর্ত্তব্য ব'লে মনে করে এবং দেশের জন্য জীবনদানও তারা গৌরবজনক মনে করে, প্রত্যেক স্কুলে সম্রাটের ছবি রাখ্‌বার জন্য একটা পৃথক ঘর থাকে এবং প্রত্যেক ছেলেরই এই ছবিকে অভিবাদন ক'রতে হয়। এমন কি টোকিওতে সম্রাটের প্রাসাদের দিকে উদ্দেশ ক'রেও তাদের নমস্কার ক'রতে হয়। সম্রাট মাঝে মাঝে শিক্ষা সম্বন্ধে ঘোষণা করেন। সম্রাট 'মেইজী' যে ঘোষণা ক'রেছিলেন তা' প্রত্যেক স্কুলে বছরে ছ'বার ক'রে পড়া হয়।

জাপানীদের সম্রাটের প্রতি শ্রদ্ধা সম্বন্ধে তোমাদের একটা গল্প ব'লব। এক সময় রুশিয়া ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। সেই যুদ্ধে যাওয়া ও দেশের জন্য অন্ততঃ ম'রতে পারার জন্য প্রত্যেক জাপানীর মধ্যে কি আগ্রহ! যারা দুর্ব্বলতা বা স্বাস্থ্যহীনতার জন্য অমনোনীত হ'ল, তাদের কাতর প্রার্থনা দেখ্‌লে সত্যই আশ্চর্য্য হ'তে হয়। দেশের জন্য যুদ্ধে যাবে সঙ্কল্প ক'রে বেরিয়ে তারা কিছুতেই ঘরে ফিরতে চায় না। এ তা'দের চরম লজ্জা ও ক্ষোভের

কথা। এ দৃশ্য দেখে স্বতঃই আমাদের মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের 'বন্দী বীরের' কয়েকটা লাইন—

"পড়ি' গেলো কাড়াকাড়ি,
আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান
তারি লাগি' তাড়াতাড়ি।"

দেশের এই সময় কয়েকজন জাপানী যুদ্ধে যাওয়ার অপেক্ষায় এক বৌদ্ধমন্দিরে বাস ক'রছিল। প্রথম দলে যাওয়ার জন্যই তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। মনে তাদের প্রচুর সাহস, দেহে অমিত বল, কিন্তু যখন স্থির হ'ল এ দলে তাদের যাওয়া হবে না, তখন তাদের মধ্যে একজন অনিশ্চিতের উদ্দেশে এ রকম নিশ্চিন্তভাবে ব'সে থাকা অসম্ভব মনে ক'রে, যে কোন রকমে মরণই শ্রেয়ঃ ব'লে স্থির ক'রল।

একদিন অনেক রাতে অন্যান্য সকলেই যখন ঘুমুচ্ছে, সে নিঃশব্দে উঠে একখানা চিঠি লিখ্‌ল। চিঠিতে লিখ্‌ল, —"দেশকে সেবা করার সুযোগ সকলের ভাগ্যে আসে না। যাদের ভাগ্যে আসে তারাও যদি সে সেবা থেকে বঞ্চিত হয়, তবে তা'দের মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।"

মৃত্যুর জন্য তৈরী হ'য়ে সে একখানা ধারাল ছোরা বা'র ক'রে 'হারিকিরি' ক'রল। সেই নিস্তব্ধ গভীর

রাত্রে নির্জ্জন বৌদ্ধমন্দিরে এ ঘটনা কেউই জান্‌তে পা'রল না। কিন্তু তার অচল দেশভক্তিতে বুঝি ভগবানের আসন ট'লে উঠল, তাই তার বন্ধুরা হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে তা'কে ঐ অবস্থায় দেখে তখনই হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত ক'রল।

হাসপাতালে তাকে রোজই জাপানীদের জয়লাভের আশার কথা শোনান হ'ত। তাকে আরও বলা হ'ত যে শীঘ্র শীঘ্র সেরে উঠে তাকে এই বিজয়লাভে জাপানীদের সাহায্য ক'রতে হবে। তোমরা শুনে আশ্চর্য্য হবে যে, সেরে উঠ্‌লেই যুদ্ধে যেতে পাবে শুধু এই আনন্দে, সে নিয়মিত সময়ের অনেক আগেই সুস্থ হ'য়ে উঠে যুদ্ধযাত্রা করেছিল।

তিন শতাব্দীতে জাপানে প্রথম শিক্ষা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হয়, চীনাদের অক্ষর ও কন্‌ফুসিয়াসের বইয়ের সাহায্যে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে এখানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার হয় এবং ৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজকুমার 'শোটকুটাশী' 'নারা'তে 'হরুজী' মন্দির ও তৎসংলগ্ন একটী বিদ্যালয় স্থাপনা করেন। এইটেই জাপানের সর্ব্বপ্রথম বিদ্যালয়। এর পর বৌদ্ধমন্দির সংলগ্ন আরও কয়েকটা স্কুল হয়।

১৮৬৮ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জাপানে বিদ্যাচর্চ্চা খুব

সামান্যই ছিল। সে সময় বিদ্যাচর্চ্চা অপেক্ষা অস্ত্রচর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা তারা অধিক অনুভব ক'রত। অল্পদিনের মধ্যে জাপানীদের উন্নতির একমাত্র কারণ, তাদের বর্ত্তমান শিক্ষা। আমাদের দেশের মত শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পেলেই এ দেশের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। কি ক'রে দেশের ও দশের কল্যাণ ক'রতে পারবে, কি ক'রে চিন্তা শক্তি বৃদ্ধি পাবে, কি ক'রে অন্যের যা কিছু ভাল গ্রহণ ক'রে নিজেদের মন্দ ত্যাগ ক'রতে শিখ্‌বে—এক কথায়—কি ক'রে প্রকৃত মানুষ হ'তে পারবে, এই হচ্ছে জাপানী শিক্ষার ভাবধারা।

শৃঙ্খলা ও বাধ্যতা সম্বন্ধে জাপানী ছেলেদের খুব বেশী ক'রে শিক্ষা দেওয়া হয়। জাপানী মেয়েদের আমাদের দেশের মেয়েদের মত কুমারী অবস্থায় পিতার, বিবাহের পর স্বামীর এবং বিধবা অবস্থায় পুত্রের অধীন থাক্‌তে হয়।

ছেলেমেয়েরা ৬।৭ বছর বয়স হোলেই স্কুলে যায়, তার আগে বাড়ীতে মার কাছে পড়ে। বিষমাকারের চীনা অক্ষর লেখ্‌বার জন্য তা'রা তুলি ব্যবহার করে। আগে সকলেই তুলি দিয়ে লিখ্‌ত, তবে এখন জাপানী fountain pen হওয়ায় বয়স্করা সেই কলম দিয়েই
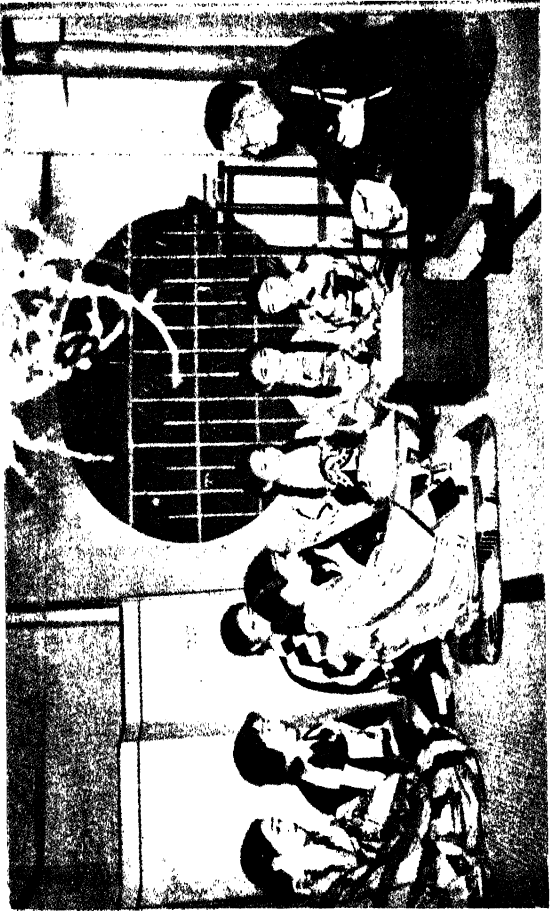
লেখেন। মা বাড়ীতে শিশুদের তুলি ধ'রে লিখ্‌তে শেখান ও গানের ভেতর দিয়ে ভূগোল শেখান হয়। তা'রা পৃষ্ঠার নীচু থেকে উপর দিকে এবং ডা'ন দিক থেকে বাঁ দিকে লেখে। জাপানীদের জাতীয় সঙ্গীতকে বলে "কিমিগায়ো"। অতি শৈশব থেকেই ছেলেমেয়েকে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে ও জাতীয় পতাকা আঁক্‌তে শেখান হয়। ছোট ছেলে-মেয়েরা কিছু জান্‌তে চাইলে অভিভাবকেরা যথাসাধ্য বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন, ধমক দিয়ে থামিয়ে দেন না।

প্রাথমিক শিক্ষা এখানে বাধ্যতামূলক। সরকারি বিদ্যালয়ে প্রত্যেককেই এই শিক্ষা লাভ ক'রতে হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি দুই ভাগে বিভক্ত, নিম্ন প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক। নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষা ৬—১২ বছর বয়সের প্রত্যেক ছেলেমেয়ে নিতে বাধ্য। এই শিক্ষা শেষ ক'রতে ৩।৪ বছর লাগে। উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষা শেষ ক'রতে দু' বছর থেকে চা'র বছর পর্য্যন্ত লাগে।

নিম্ন প্রাথমিকে নীতি, জাপানী ভাষা, পাটীগণিত ও ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হয়। মেয়েদের ঐ সঙ্গে সেলাই শিক্ষা দেওয়া হয়। উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নীতি, জাপানী ভাষা, পাটীগণিত, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান,

অঙ্কন, সঙ্গীত ও ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হয়। মেয়েদের এ ছাড়া সেলাই শিক্ষা দেওয়া হয়।

যারা চা'র বছরের জন্য বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তাদের ইংরাজীও শেখান হয়। ছাত্রের স্বাস্থ্য দুর্ব্বল হ'লে কয়েকটী বিষয় বাদ দেওয়া হয়। উচ্চ প্রাথমিক স্কুলে যারা দু'বছর প'ড়েছে তারাই মধ্যস্কুলে প্রবেশের যোগ্য ব'লে বিবেচিত হয়। কিন্তু প্রতি বৎসর ছাত্র সংখ্যা অধিক হওয়ার জন্য পরীক্ষা ক'রে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র নেওয়া হয়। এখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিষয়গুলি ছাড়াও চীনা ভাষা, বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শিক্ষা দেওয়া হয়।

যে সব ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ ক'রতে ইচ্ছুক তাদের তিন বছর উচ্চইংরাজী স্কুলে শিক্ষালাভ ক'র্তে হয়, এখানেও প্রবেশের পূর্ব্বে পরীক্ষা ক'রে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র নেওয়া হয়। এখানকার পড়া শেষ হ'লে, ছেলেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের যোগ্য হ'তে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তিনভাগে বিভক্ত, প্রথম বিভাগে যারা আইন বা সাহিত্য অধ্যয়ন ক'র্‌বে, দ্বিতীয় বিভাগে যারা ইঞ্জি-নীয়ারীং, বিজ্ঞান বা কৃষিবিদ্যা অধ্যয়ন ক'রবে, আর তৃতীয় বিভাগে যারা চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন ক'র্‌বে। মেয়েদের

চা'র বছর উচ্চ শিক্ষার জন্য প'ড়তে হয়, তারা জাপানী ভাষা, ইংরাজী, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, অঙ্কন, সেলাই, সঙ্গীত, গৃহিণীপনা ও ব্যায়াম শেখে।

জাপানে অন্ধ ও বোবাদের জন্যও পৃথক স্কুল আছে, তোকিওতে অন্ধ ও মূক বিদ্যালয়ের পাঠের সময় তিন বছর থেকে পাঁচ বছর।

বিভিন্ন দেশের ভাষা শিক্ষার জন্য ছেলেদের একটা সরকারি স্কুল আছে, এখানে শুধু ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। যারা ব্যবসায়ের জন্য বিদেশে যেতে ইচ্ছা করেন তাঁরাই সাধারণতঃ এই স্কুলে শিক্ষা লাভ করেন, এখানকার শিক্ষা-কাল তিন বছর। এখানে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। এছাড়া অঙ্কন, ভাস্কর্য্য ও স্থপতিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্যও পৃথক্ স্কুল আছে। প্রত্যেকটীর শিক্ষাকাল চা'র বছর। উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত শিক্ষার জন্যও পৃথক স্কুল আছে, সেখানে ছেলেমেয়ে যার ইচ্ছা শিখতে পারে, শিক্ষা শেষ হ'তে চা'র বছর লাগে।

১৮৭৭ সালে "পীয়ারস্ স্কুল" নামে একটা স্কুল স্থাপিত হয়, তখন কেবল রাজবংশীয় ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় ছেলেদের ঐ স্কুলে প্রবেশাধিকার ছিল, এখন সে বাধা না থাক্‌লেও ওখানে খরচ বেশী বলে সাধারণ গৃহস্থের ছেলেরা প'ড়তে

পারে না, বড়লোকের ছেলেরাই পড়ে। বড়লোকের মেয়েদের জন্যও "পীয়ারেস্ স্কুল" নামে একটা স্কুল আছে।

সমস্ত স্কুলেই সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্য্যন্ত পড়ান হয়। দু'পুরে ১২টা থেকে ১টা, এক ঘণ্টা খাবার ছুটি থাকে। জাপানী ছেলে মেয়েরা বাড়ী থেকে ভাত, মাছ প্রভৃতি একটা ছোট্ট বাক্সে ভ'রে রঙ্গিন কাপড়ে বেঁধে নিয়ে যায়। ঐ কাপড়কে 'ফুরোশিকি' বলে।

প্রত্যেক স্কুলের ছেলে প্যাণ্টালুন ও কেপ কলার কোট পরে। কোটের বোতাম ও টুপিতে স্কুলের বিশেষ চিহ্ন থাকে যা' দেখে বোঝা যায়, কে কোন স্কুলে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা চৌকোণা টুপি পরে, মেয়েদের পোষাক সব স্কুলেরই প্রায় এক রকম। স্কুলের এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরাও নোট লেখবার জন্য আমাদের দেশের পাঠশালার ছেলেদের মত দোয়াত ঝুলিয়ে নিয়ে যেত। আজকাল পাশ্চাত্য সভ্যতার আবহাওয়ায় এবং fountain pen সৃষ্টি হওয়ায় এ অভ্যাসটা অনেকটা ক'মে গেছে।

জাপানে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে যথেষ্ট সৌহৃদ্য থাকে, স্কুলে কোন ছাত্রকে কখন শারীরিক শাস্তি দেওয়া হয় না,

এঁরা ভালবাসার দ্বারা ছাত্রকে বশ ক'রতে চেষ্টা করেন। ছাত্র কোন কর্ত্তব্যে অবহেলা ক'রলে ভর্ৎসনাই তার যথেষ্ট শাস্তি। মাঝে মাঝে ছেলেমেয়েরা দলবদ্ধ হ'য়ে শিক্ষকের সঙ্গে ভ্রমণে বা'র হয়। এতে একদিকে যেমন তাদের স্বদেশ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা গ'ড়ে ওঠবার সুযোগ পায়, অন্যদিকে তেমনি বাইরের নির্ম্মল বায়ু ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনে শরীর ও মন উভয়েরই উন্নতি হয়।

এমন অনেক জাপানী ছাত্র আছে যারা নিজেরা রোজগার ক'রে সেই টাকায় পড়ে, কেউ বা খবরের কাগজে লেখে বা ছেলে পড়ায় এবং কেউ বা অন্য কাজের অভাবে কাগজ বিক্রী, রিক্সা টানা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, এমন কি জুতো পরিষ্কার ক'রতেও কুণ্ঠিত হয় না। লেখাপড়া শেখার জন্য কোন সৎকাজই এরা নীচ বা অপমান জনক বলে মনে করে না।

জাপানের শিক্ষক ও ছাত্রদের সম্বন্ধে একটা গল্প ব'লব, গল্প হ'লেও সত্যের উপরেই তার ভিত্তি। আমাদেরই একজন বাঙালী শিক্ষার জন্য জাপানে গিয়েছিলেন। জাপানে বোর্ডিংয়ের মত থাকা ও খাওয়ার খরচ দিলে জাপানী পরিবারে থাকা যায়। সেই রকম এক পরিবারের সঙ্গে তিনি থাকতেন, কয়েকদিন তাঁর ক্লাসে যেতে

দেরী হওয়ায় অধ্যাপক কারণ জিজ্ঞাসা ক'রলে তিনি বল্‌লেন যে, সময়ে ভাত না হওয়ায় তাঁর আস্‌তে দেরী হ'য়েছে।

অধ্যাপক ব'ল্‌লেন, "পয়সা দিয়ে থাক অথচ তোমার নিজের যদি সুবিধাই না হয়, তবে সেখানে থাকার দরকার নেই। আমি তোমার জন্য অন্য যায়গার ব্যবস্থা করে দেব।"

কয়েকদিন বাদে অধ্যাপক ব'ল্‌লেন যে, তাঁর থাকবার যায়গা স্থির হ'য়েছে এবং পরদিনই তাঁকে সেখানে যেতে হবে। শুধু এই যোগাড় ক'রে ও সংবাদ দিয়েই তিনি নিশ্চিন্ত নন। পাছে বিদেশে একা সমস্ত জিনিষ নিয়ে অন্য যায়গায় যেতে অসুবিধা হ'তে পারে মনে ক'রে, তিনি (অধ্যাপক) পরদিন সকালে তাঁর বাসায় গিয়ে উপস্থিত।

তখন এঁর আর সব যোগাড় ক'রে নেওয়া হ'য়েছে। কয়েকটা জিনিষ নিজে হাতে ক'রে নিয়ে বাকী কুলির মাথায় চাপিয়েছেন। অধ্যাপক কিছু প'ড়ে রইল কিনা তদন্ত ক'রতে গিয়ে দেখেন, এক বোঝা কাঠ এক কোণে প'ড়ে র'য়েছে। বাঙালীর ছেলে কাঠ ঘাড়ে ক'রে নিলে কে কি মনে করবে, হয়ত বা সম্মানের লাঘব হবে মনে ক'রে ইতস্ততঃ ক'রছেন, এর মধ্যে অধ্যাপক নিজেই কাঠের

বোঝা ঘাড়ে নিয়ে অগ্রসর হ'লেন। ছাত্রটি আপত্তি করায় তিনি ব'ললেন, "এজন্য তুমি কিছু ভেব না। পথে যদি কোন জিনিষ প'ড়ে যায় সেদিকে তোমাকে সতর্ক দৃষ্টি রাখ্‌তে হ'বে।"

অধ্যাপকের এই সহজ ব্যবহারে ছাত্রটি খুবই সঙ্কুচিত হ'লেন। কিন্তু সেইদিন থেকে প্রকৃত শিক্ষিতের আদর্শের যে ছাপ তাঁ'র মনে এঁকে গেল, তা'র দ্বারা তিনি নিজের ও দেশবাসীর যথেষ্ট উপকার করেছেন ও ক'রছেন।

ব্যায়ামের মধ্যে তরবারি ক্রীড়া, মল্ল যুদ্ধ, তীর ছোঁড়া ও যুযুৎসু প্রত্যেক স্কুলেই শিক্ষা দেওয়া হয়। আমাদের দেশে অনেক যায়গায় যুযুৎসু প্রবর্ত্তিত হ'য়েছে। গায়ের জোর কম হ'লেও বেশী জোরের লোককে কি ক'রে হারিয়ে দেওয়া যায়, এই হ'ল যুযুৎসুর মূল নীতি। বড় বড় স্কুলে দাঁড় টানার ব্যবস্থা আছে এবং অন্যান্য অনেক পাশ্চাত্য খেলাও প্রবর্ত্তিত হ'চ্ছে।

জাপানী খেলা

জাপানী ছেলেমেয়েদের অনেক রকম খেলা আছে, তা'র মধ্যে কতকগুলোতে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তা'দের বাপ, মা এমন কি ঠাকুর্দ্দা, ঠাকুরমাও যোগ দেন। দু'জন মেয়ে একটা শোলার মাথায় পালক লাগিয়ে হাল্কা ব্যাট দিয়ে এমন ভাবে মারে যেন মাটিতে প'ড়তে না পারে—অনেকটা ব্যাড্‌মিণ্টন খেলার মত। তবে যা'র দিকে পালক মাটিতে পড়ে তা'রই হার হয়, যে হারে তা'র মুখে খানিকটা সাদা রং লাগিয়ে দেওয়া হয়।

ছেলেরা লাটিম ঘুরায় ও লাটিমে লাটিমে যুদ্ধ লাগায়। একটা সীমানা ঠিক করা থাকে, তা'রই মধ্যে লাটিম ঘোরাতে হয়। একটা লাটিম যখন ঘুরছে তখন অন্য একটা লাটিম তা'কে লক্ষ্য ক'রে ছোঁড়ে এবং তা'কে মেরে সীমানার বা'র ক'রে দিয়ে ঘুরতে থাক্‌লে জয় হয়, আমাদের দেশেও এ খেলা আছে। তবে আমাদের দেশে ছেলেরা খেল্‌তে খেল্‌তে যেমন প্রায়ই ঝগড়া বা মারামারির সৃষ্টি করে ও দেশে সে রকম হয় না। কোন রকম গণ্ডগোল হ'লে নিজেদের মধ্যে যে সব চেয়ে

বড় থাকে, তা'কেই মীমাংসার ভার দেয় এবং তা'র মীমাংসা সকলেই স্বীকার ক'রে নেয়।

বালি নিয়ে রাস্তার ধারে ছবি এঁকে এরা এক রকম খেলা করে। কে কত অল্প সময়ের মধ্যে ছবি আঁক্‌তে পারে এই নিয়ে অনেক সময় নিজেদের মধ্যে পাল্লা হয়। প্রত্যেক ছেলের কাছে পাঁচটা থলেতে কাল, লাল, হল্‌দে, নীল ও সাদা এই পাঁচ রকমের বালি থাকে। চৌকো ক'রে প্রথমে সাদা বালি ছড়ায়, তারপর কাল বালি নিয়ে যে কোন পাখী বা জন্তুর (যা' আঁকবার ইচ্ছা হয়) আকার তৈরী করে; তা'র উপর অন্য রংয়ের বালি ছড়িয়ে আঁকা শেষ করে। অনেক সময় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এই রকম খেলাচ্ছলে বেশ ভাল ভাল ছবি আঁকে।

কিন্তু এই বালির ছবি আঁকা যিনি শেখান তিনি নিজে যখন ছবি আঁক্‌তে আরম্ভ করেন তখন ভারি সুন্দর দেখায়। নীল ও হল্‌দে বালির বস্তা থেকে তিনি একসঙ্গে দু'রকম বালি নিয়ে আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে ফেলেন, কেউ কা'রও সঙ্গে মেশে না, তারপর দু'টোকে একটু ঝাঁকানি দিয়ে একসঙ্গে মিশিয়ে একটা উজ্জ্বল সবুজ রংয়ের সৃষ্টি করেন; আবার দরকার হ'লে সেই হাতের মধ্য থেকেই আবার নীল ও হল্‌দে রং পৃথক্ ক'রে ফেল্‌তে পারেন।

বাড়ীতে ব'সে খেল্‌বার মতও এদের অনেক খেলা আছে। তা'র মধ্যে এক রকম তাস খেলা আছে সেটা ছেলেমেয়েদের খুব প্রিয়। কতকগুলো তাসে এক একটা প্রবাদ-বাক্য লেখা থাকে এবং কতকগুলোতে ঐ প্রবাদের ছবি আঁকা থাকে। ছেলেমেয়েরা খেল্‌বার সময় গোল হ'য়ে বসে এবং সকলকে সমান ভাগ ক'রে তাস দেওয়া হয়। তা'র মধ্যে একজন শুধু পড়ে। যখন সে এক একটা প্রবাদ পড়ে, তখন সেই প্রবাদের ছবি যা'র কাছে থাকে সে এতে সাড়া দিয়ে সেই তাস দেয়। যা'র হাতের তাস সকলের আগে ফুরোয় তা'রই হয় জয়, আর যা'র হাতে সকলের শেষে তাস থাকে সেই হেরে যায়। ছেলে হেরে গেলে তা'র মুখে কালি কিম্বা রংয়ের একটা ছাপ মেরে দেয় আর মেয়ে হেরে গেলে তা'র চুলে একগোছা খড় গুঁজে দেয়।

আমাদের দেশে বিশ্বকর্ম্মা পূজার দিন যেমন ঘুড়ি উড়ানর পালা পড়ে ওদেশেও নববর্ষের প্রথম দিনে তেমনি সকলেই ঘুড়ি উড়ায় এবং কখন কখন দু'টো দল ক'রে পাল্লা দেয়; যে ঘুড়িগুলো কেটে যায় বিজয়ী দলকে সেইগুলো পুরস্কার দেওয়া হয়।

এ ছাড়া প্রতি বৎসর প্রত্যেক জাপানী পরিবারে পুতুল ও পতাকার উৎসব হয়, মেয়েদের পুতুলের উৎসব প্রতি

বৎসর ৩রা মার্চ্চ তারিখে হয়। এই দিনে যা'র যেখানে যত ভাল ভাল পুতুল থাকে বা'র ক'রে অতিথিদের ঘরে সুন্দর ক'রে সেল্‌ফের তাকের উপর সাজায়। এই সব পুতুল খুব যত্ন ক'রে রাখে এবং এক একটা পুতুল হয়ত বহু শতাব্দীর পুরাণ হবে ; প্রত্যেক পুতুল তা'র যুগ অনুযায়ী পোষাকে সাজান থাকে। এদিক দিয়ে এর একটা মস্ত বড় ঐতিহাসিক মূল্য আছে। কেননা, পুতুলের চেহারা ও পোষাক-পরিচ্ছদ থেকে ছেলেমেয়েরা তা'দের পূর্ব্বপুরুষদের সম্বন্ধে একটা ধারণা ক'রতে পারে।

ছোট মেয়েদের রোজ খেলা করার জন্য কতকগুলো সাধারণ পুতুল থাকে কিন্তু এ ছাড়া কতকগুলো ভাল ভাল পুতুল খুব যত্ন ক'রে তুলে রেখে দেয় এবং বছরে একবার মাত্র এই সময়ে বা'র করে। এই পুতুলের ছোট ছোট বাসন ও সংসারের সব রকম জিনিষই থাকে, তা'রই সাহায্যে রেঁধে মেয়েরা এই দিন একটা বেশ ভোজের ব্যবস্থা করে। মেয়ে জন্মানর সঙ্গে সঙ্গে এই পুতুল যোগাড় ক'রতে হয় এবং বিয়ে হ'য়ে গেলে শশুর বাড়ী যাওয়ার সময় তা'রা সঙ্গে নিয়ে যায়। এ উৎসবের জাপানী নাম "ও হিলামাৎস্নুরি"

এই পুতুল উৎসব হওয়ার আগে জাপানী দোকানগুলো

নানা রকম পুতুল দিয়ে সাজাতে থাকে। গরীব যা'রা তা'রা রং করা মাটির পুতুল কেনে এবং বড়লোকেরা দামী কাপড় পরানো কাঠের পুতুল কেনে। বড়লোকের পুতুলের মধ্যে সম্রাট্, সম্রাজ্ঞী এবং অন্যান্য বড় বড় লোকের মূর্ত্তি থাকে। এদের বিশেষত্ব এই যে, প্রত্যেক পুতুলটি ইতিহাস সম্মত। এই উৎসবকে কখন কখন 'পীচ' উৎসব বলে— কেননা, এই সময় 'পীচ' গাছে ফুল ফুটে ভারি সুন্দর দেখায়।

মেয়েদের মত ছেলেদেরও এই পুতুল উৎসব আছে। প্রতি বৎসর ৫ই মে এই উৎসব হয়। ছেলেদের পুতুল দেশের বড় বড় বীরদের মূর্ত্তি। ছোট বেলা থেকে ছেলেদের মনে বীরত্বের বীজ বপন ক'রে দেওয়াই এই অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য। এই দিনে তাদের পতাকা উৎসবও হয়।

প্রত্যেকের বাড়ীর সাম্নে একটা বড় বাঁশ পুঁতে তা'রই আগা থেকে রঙিন কাগজের তৈরী carp মাছ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। ঐ বছরের মধ্যে যে বাড়ী ছেলে হয় সেখানকার মাছটা আকারে অপেক্ষাকৃত বড়। মাছের ভিতরটা থাকে ফাঁপা—তাই হাওয়ায় যখন দোলে তখন দেখে মনে হয় যেন জলে সাঁতার দিচ্ছে। জাপানীরা carp মাছ ঝুলিয়ে দেয় তা'র কারণ—এরা স্রোতের বিপরীত দিকেও

চল্‌তে পারে। জীবনসমুদ্রে ছেলেরাও যা'তে দুঃখ-কষ্ট অতিক্রম ক'রে সফলতার দিকে অগ্রসর হ'তে পারে এটা দিয়ে তাই বোঝান হয়।

এই উৎসব উপলক্ষে অনেক সময় ছেলেরা নকল সৈন্য সেজে দু'দলে ভাগ হয়ে যুদ্ধ করা দেখায়। অনেক আগে ওখানে হেকী ও গেঞ্জি নামে দু'টো প্রতিদ্বন্দ্বী দল ছিল। এদের মধ্যে একজন হেকীর দল এবং একজন গেঞ্জির দল সাজে। হেকীর দলের হাতে লাল ও গেঞ্জির দলের হাতে সাদা নিশান থাকে, আর প্রত্যেকের মাথায় মাটির তৈরী শিরস্ত্রাণ থাকে। দুই পক্ষের হাতে বাঁশের তরবারি থাকে। এই তরবারি দিয়ে যথা নিয়মে পরস্পরের মাথায় শিরস্ত্রাণ লক্ষ্য ক'রে আঘাত করে। যা'র মাথার শিরস্ত্রাণ ভেঙ্গে যাবে তা'কেই পরাজিত ব'লে গণ্য করা হবে; যে পক্ষের শিরস্ত্রাণ বেশী ভেঙ্গে যাবে সেই পক্ষেরই শেষ পর্য্যন্ত পরাজয়। ছোটবেলা থেকে খেলার ভিতর দিয়েও এদেশের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য তৈরী করা হয়। জাপানী ছেলেদের এ উৎসবকে 'তাংগো নো সেক্কু' বলে।

জাপানী বাড়ী

জাপানী বাড়ীর নির্ম্মাণ প্রণালী অত্যন্ত সাদাসিদে। উপরে টালি কিম্বা পাতার তৈরী ছাদ আর সেগুলোকে মাথায় ক'রে রেখেছে কতকগুলো খুঁটি। বারান্দার শেষে ও ঘরের ছাদের নীচেকার কড়িতে খাঁজ কাটা আছে, তা'র মাঝে তক্তাগুলো যাতায়াত করে। দরকারমত তক্তাগুলোকে একধারে সরিয়ে সমস্ত বাড়ীটাকে একটা ঘরে পরিণত করা যায়, আবার দরকার হ'লে এগুলোকে সরিয়ে এনে বাড়ীটাকে পৃথক্ পৃথক্ ঘরে ভাগ ক'রে নেওয়া চলে। যেগুলো দরজার কাজ করে তা'দের 'কারাকামি' বলে। এদের কাঠামো (frame) কাঠের তৈরী কিন্তু মাঝখানে কাগজ কিম্বা কাপড় দিয়ে দু'দিক্ থেকেই আঁটা। অনেক সময় এই কাগজের উপর একটা সুন্দর ছবি আঁকা থাকে।

অধিকাংশ জাপানী বাড়ীই একতলা, তা'র একটা কারণ জাপানে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়। ইট-কাঠের বড় বাড়ী হ'লে চাপা প'ড়ে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা যেমন বেশী, তেমনি তৈরী ক'রতেও খুব খরচ। মাঝে মাঝে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতেও অনেক বাড়ী ধ্বংস হ'য়ে যায়। এই সব

কারণে জাপানীদের প্রায়ই নূতন বাড়ী তৈরী ক'রতে হয় ব'লে তা'রা এই রকম সাদাসিধা ভাবে তৈরী করে।

অধিকাংশ দরিদ্র জাপানী পরিবারে দিনের বেলায় একটা বড় ঘর থাকে এবং রাত্রে 'কারাকামির' সাহায্যে দরকারমত ঘর তৈরী ক'রে নেয়। বাড়ীর সাম্‌নে রাস্তার দিকে খোলা থাকে, ইচ্ছা ক'রলে সাম্‌নে একটা কাগজের পর্দ্দা দিয়ে দেওয়া যায়। কাঠের জানালাগুলোকে 'আমাদো' বলে। এগুলোও একধার থেকে অন্যধারে সরিয়ে দেওয়া যায়।

জাপানীরা রোদ ও বাতাস খুব ভালবাসে। কাজেই খুব ঠাণ্ডা বা ঝড় জল না হ'লে বাড়ীর সাম্‌নেটা সব সময় খোলা থাকে, খুব বেশী রোদ হ'লে কখন কখন একটা পর্দ্দা টানিয়ে দেয়। তা'র উপর সাদা রঙে কর্ত্তার নামের প্রকাণ্ড একটা সাঙ্কেতিক চিহ্ন আঁকা থাকে। জাপানীদের ঘরের আস্‌বাব পত্র কিছু নেই বল্‌লেও চলে। মেঝেতে বেশ উঁচু ক'রে মাদুর পাতা থাকে, তার উপর ব'সবার ও ঘুমানোর কাজ দুইই চলে। টেবিলের দরকার হ'লে এই বিছানার পাশে একটা ছোট টুল দেয়।

ছোট বড় সব বাড়ীই ঐ রকম তৈরী, তবে বড়লোকের বাড়ীর কাঠগুলো ভাল, তা'তে নানা রকম কারুকার্য্য করা

থাকে। 'কারাকামি'গুলোতে বেশ সুন্দর ছবি আঁকা থাকে এবং ঘরের মধ্যে 'কাকিমনো' (জাপানী ছবি) টাঙ্গান থাকে।

রাত্রে শোবার সময়ও ঘরের কোন পরিবর্ত্তন হয় না, কেবলমাত্র কয়েকটা লেপ ও কাঠের বালিশ এনে মাতুরের বিছানার উপর পেতে দেয়। তা'হ'লেই রাত্রের বিছানা পাতা হ'য়ে গেল। মেঝেতে সব সময়ের জন্যই পুরু মাতুর পাতা থাকে ব'লেই জাপানীরা বাড়ীর ভিতর জুতা পরে না, কেননা এতে মাতুর ময়লা হ'য়ে যেতে পারে।

সাধারণ জাপানীদের ঘরে আসবাব-পত্রের বাহুল্য নেই। বড়লোকের বাড়ী হ'লেও পৃথক্ বাড়ীতে আসবাব-পত্র থাকে, দরকার মত নিয়ে আসে আবার দরকার শেষ হ'য়ে গেলে সেই বাড়ীতে রেখে আসে। জাপানীরা এক ধরণের জিনিষ ঘরে রাখা পছন্দ করে না। তাই উল্টে পাল্টে নিত্য নূতন ধরণের জিনিষে ঘর সাজায়।

এতক্ষণ জাপানী বাড়ী সম্বন্ধে ব'ললাম। এইবার তা'রা সমস্তদিন কি ভাবে কাজ করে সে সম্বন্ধে কিছু বল্‌ব। ভোর পাঁচটার সময় বাড়ীর গৃহিণী সকলের আগে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই ঘরে বাতি নিবিয়ে দেন, কারণ জাপানীরা

সারারাত ঘরে আলো জ্বালিয়ে নিদ্রা যায়। স্বামী ঘুম থেকে উঠ্‌বার আগেই স্ত্রী প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ ক'রে প্রাতরাশের ব্যবস্থা করেন। এর মধ্যে চাকর উঠে ঘরের "আমাদো" গুলো খুলে দেয়, সেই শব্দে সকলে ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধোয়ার পর চায়ের সরঞ্জাম এসে উপস্থিত হয়।

কর্ত্তার পোষাক পরা হ'লে যেখানে বাস্তুদেবতা আছেন গৃহিণী সেখানে ধূপ-ধূনা জ্বালিয়ে, চা'লের নৈবেদ্য ক'রে দেবতার আরাধনা করেন। সাড়ে সাতটার মধ্যে ছেলে-মেয়েরা স্কুলে রওনা হয় কাজেই তার আগে তাদের খাওয়ার তত্ত্বাবধান ক'রে ছেলেদের দুপুরে জলখাবারের বাক্সে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন ও মেয়েদের সাজসজ্জা ক'রে চুলে বিনুনি ক'রে দেন।

ছেলেমেয়েরা স্কুলে গেলে আগে কর্ত্তা ও পরে গৃহিণী আহার করেন। কর্ত্তা অফিসে যাওয়ার সময় গৃহিণী দরজা পর্য্যন্ত যেয়ে হাঁটু ভেঙ্গে মাথা নীচু ক'রে বিদায় সম্ভাষণ জানান ও মুখে "ইত্তে হরাষ যাই মাষি" বা গিয়ে আসুন বলেন, এই সময় গৃহিণীর সঙ্গে পরিচারিকাও ঐ রকম করে। গৃহিণীর সঙ্গে পরিচারিকার এক রকম কাজ আমাদের কাছে একটু বিসদৃশ মনে হয় কিন্তু জাপানী সমাজে চাকর-চাক্‌রাণীর পদ মোটেই নীচ নয়—এমন কি

ব্যবসাদারদের চেয়ে সমাজে এদের স্থান উঁচুতে। দুপুরে মেয়েরা কেউ বা ঘুমোয় কেউ বা সেলাই করে। আবার কেউ বা বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে বা দোকানে জিনিষ কিন্‌তে যায়।

সন্ধ্যায় কর্ত্তার ফেরবার সময় স্ত্রীকে দরজার সাম্‌নে উপস্থিত থেকে অভ্যর্থনা ক'রতে হয়। তারপর একটু বিশ্রাম ক'রে তিনি স্নান করেন; জাপানে সকলেই সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরে স্নান করেন। গরমজলে স্নান ক'রতে এঁরা খুব ভালবাসেন। এমন কি গ্রীষ্মকালে গলদঘর্ম্ম অবস্থায়ও গরম জলের টবের মধ্যে গা-ডুবিয়ে ব'সে থাকেন। স্নানের পর আহারে প্রবৃত্ত হন, সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যেই তাঁ'দের খাওয়া শেষ হ'য়ে যায়। গ্রীষ্মকালে খাওয়ার পর অনেক সময় সকলে মিলে বেড়াতে যান। জাপানীরা তিন বেলা ভাত খায়, এরা খুব মাছ ও ডিম প্রিয়। শাক-সজ্জীর মধ্যে এরা সবচেয়ে বেশী মূলা খায়, তাও আবার টাট্‌কা রাঁধার চেয়ে বাসীই পছন্দ করে বেশী।

জাপানী উৎসব

আমাদের দেশের মত জাপানীদেরও বার মাসে তের পার্ব্বণ। সমস্ত উৎসবের নাম ও বর্ণনা করা এখানে সম্ভব নয়, কাজেই তিনটে প্রধান উৎসব সম্বন্ধে ব'লব।

নব বর্ষের প্রথম দিন জাপানীদের সর্ব্বপ্রধান উৎসব। এ সময় জাপানে খুব শীত থাকে এবং অনেক সময় এত বেশী বরফ পড়ে যে, বাইরে কোন উৎসব করা সম্ভব হয় না। তবু এরা বাড়ীর ভিতরেই উৎসব করে। এই দিন প্রত্যেকে আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের বাড়ী গিয়ে নব-বর্ষের প্রীতি সম্ভাষণ জানিয়ে আসে।

নববর্ষের মঙ্গলচিহ্ন তিনটি। প্রথম কুলের ফুল। শীত ও বরফ পড়া সত্ত্বেও এরা ফোটে। মানুষও যেন জীবনের শত দুঃখ-কষ্ট অতিক্রম ক'রে এদের মত নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি ক'রতে পারে এই প্রার্থনা করা হয়। দ্বিতীয় দেবদারু গাছ। এর অর্থ দেবদারুগাছ যেমন চিরনবীন বেশ ধারণ ক'রে থাকে জাপানীরাও যেন তেমনি চিরদিনই স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য উপভোগ ক'রতে পারে। তৃতীয় চিহ্ন বাঁশ। এর অর্থ এই যে, দুঃখ-কষ্টে

প'ড়েও সকলে যেন বাঁশের মত সোজা হ'য়ে উঠ্‌তে পারে। দোকান বাড়ীর সাম্‌নে দেবদারু পাতা ও বাঁশ রাখা হয়। সাতদিন পর্য্যন্ত এরকম থাকে।

পুরাণ বছরের শেষ দিন ঘর, দরজা পরিষ্কার করা হয়। নববর্ষের প্রথম দিন জাপানে ঘর ঝাঁট দেওয়ার নিয়ম নেই পাছে গৃহে দেবতা রাগ ক'রে চ'লে যান। এই দিন খুব ভোরে উঠে সকলে একটা উঁচু যায়গায় একত্রিত হ'য়ে সূর্য্যোদয় দেখ্‌বার জন্য অপেক্ষা করে। জাপানে কথিত আছে যে, নববর্ষের প্রথমদিন সূর্য্যোদয় দেখ্‌লে নাকি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়।

সবাই সেদিন নূতন পোষাক পরে; এমন কি গরু, ঘোড়া পর্য্যন্ত। কোন রকম বিপদের ভয় থাক্‌লে ভাগ্যদেবীর মন্দিরে গিয়ে পূজা দিতে হয়। এই উপলক্ষে ২।৩ দিন কাজ-কর্ম্ম বন্ধ থাকে। সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে আর একটা উৎসব হয়। ঐদিন সমস্ত স্কুল, অফিস প্রভৃতি বন্ধ থাকে এবং প্রত্যেক জাপানী নিজেদের বাড়ী, দোকান রাস্তা প্রভৃতি নানাভাবে সাজায়। সাধারণতঃ সুন্দর ও সৌন্দর্য্যপ্রিয় জাপানীদের এদিন আরও সুন্দর দেখায়।

যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ৬৬০ বৎসর আগে জাপানের প্রথম সম্রাট্ জিমূর সিংহাসন আরোহণ উপলক্ষ ক'রে প্রতি

বছর ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সমগ্র দেশব্যাপী একটা বিরাট উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। যিনি বর্ত্তমান জাপানের প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন, শিক্ষা ও সভ্যতার আলোক দিয়ে দেশবাসীকে বিশ্বের সভ্য সমাজে পরিচিত হওয়ার পথের সন্ধান দিয়েছিলেন, আজকার নবীন ও জাগ্রত জাপান তাঁ'র কথা ভোলেনি বা কোন দিনও ভুল্‌বে না তা'রই প্রমাণ পাওয়া যায় এই উৎসবে।

এছাড়া প্রতি বৎসর ৩রা মার্চ্চ 'হিনা মাৎসুরি' বা জাপানী মেয়েদের পুতুল খেলার উৎসব হয় এবং ৫ই মে তারিখে ছেলেদের পুতুল ও পতাকা উৎসব হ'য়ে থাকে। এ সম্বন্ধে আগেই তোমাদের বলেছি, কাজেই পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। বসন্তের আগমনে জাপানের বাগানে বাগানে সাকুরা ফুল ফুটে সমস্ত দেশকে অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত করে। এই সাকুরা ফুল ফোটা উপলক্ষে দেশে একটা উৎসব হয়।

প্রতি বৎসর জানুয়ারী মাসে হিরোশিমা অঞ্চলে কচ্ছপ নাচের উৎসব হয়। খুব পাতলা কাঠের তক্তা কেটে কচ্ছপ তৈরী করা হয়। তা'র পায়ে ও শুঁড়ে পয়সা লাগিয়ে ভারি করা হয়। তারপর তা'কে একটা বড় ঘরের মাঝখানে রেখে দশ বারো জন একত্র হ'য়ে জোরে

পাখা দিয়ে বাতাস দেয় ও "কচ্ছপ নাচে কচ্ছপ নাচে" ব'লে চীৎকার করে। বাতাসের জোরে কাঠের কচ্ছপ মেঝের উপর ন'ড়ে বেড়ায় এবং প্রত্যেকেই জোরে বাতাস দিয়ে নিজের দিক্ থেকে অন্যের দিকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করে; কেননা, কচ্ছপ যা'র কাছে গিয়ে থাম্‌বে তা'রই হবে হার এবং তাকে সকলের সামনে ঘরের মধ্যে তখনই তিনবার কচ্ছপের মত হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াতে হবে।

ওবি অঞ্চলে ১৫ই আগষ্ট তারিখে চন্দ্র উৎসব উপলক্ষে ছেলেরা একত্রিত হ'য়ে Tug-of-war বা দড়ি টানাটানি খেলা করে।

এখানে ৭ই জুন সমুদ্রের বাড়বানলের প্রতি সম্মান দেখাবার জন্য এক উৎসব হয়। সেই দিন বন্দরের সমস্ত জাহাজ ও নৌকার উপর মাদুর পেতে গান, বাজনা, গল্প প্রভৃতিতে কাটান হয়। প্রত্যেক জাহাজ ও নৌকার মাস্তুলে একটা ক'রে লণ্ঠন ঝুলিয়ে রাখা হয়। রাত্র নয়টার সময় বৌদ্ধমন্দিরে আরতির ঘণ্টা বেজে ওঠ্‌বার সঙ্গে সঙ্গে লণ্ঠনগুলি জ্বেলে দেওয়া হয় এবং হাজার খানা ছোট ছোট তক্তার উপর হাজার বাতি জ্বেলে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। বাড়বানলের প্রতিরূপ এই ভাসমান বাতিগুলো যেন বাড়বানলকে আরতি করে।

মৃত পূর্ব্বপুরুষদের উপলক্ষ ক'রে প্রত্যেক বছর গ্রীষ্ম-কালে একটা উৎসব হয়। এই উৎসব জাপানের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ভাবে হয়। প্রত্যেক যায়গাতেই ছেলেরা সুন্দর পোষাক প'রে পাখা, পতাকা ও লণ্ঠন হাতে নিয়ে গান গাইতে গাইতে দল বেঁধে পথ দিয়ে চলে।

নাগাসাকীতে তিন দিন ব্যাপী এই উৎসব হয়। প্রথম উৎসব রাত্রে মাত্র পূর্ব্ব বৎসরে মৃত ব্যক্তিদের কবরের চারি ধারে উজ্জ্বল আলো দিয়ে সাজান হয়। এমন কি গোরস্থানে যাওয়ার রাস্তা ও সেই রাস্তার দু'ধারের দোকান পর্য্যন্ত সুন্দর ক'রে সাজান হয়। এই সময় পাহাড়ের উপর আলো জ্বেলে দেয় এবং গোরস্থানে বাজী পোড়ান ও অনেক রকম আমোদ-আহ্লাদ হয়। তা'রপর সকলে সমবেত হ'য়ে পূর্ব্বপুরুষদের সম্মান দেখাবার জন্য সাকে (মদ) পান করে। সকলের শেষে একটা মজার ঘটনা ঘটে।

প্রায় বেলা দু'টোর সময় উজ্জ্বল আলো হাতে ক'রে একদল লোককে উঁচু থেকে নীচে সমুদ্রের ধারে আস্‌তে দেখা যায়। সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আস্‌বার আগেই পূর্ব্বপুরুষের প্রেতাত্মাদের পৃথিবী থেকে এক বছরের মত বিদায় নিতে হবে। সাগরের কিনারায় খড়ের তৈরী

হাজার হাজার ছোট জাহাজ থাকে এবং প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু কিছু ফল ও টাকা দিয়ে, গোরস্থানে যে রঙীন লণ্ঠনগুলো ছিল সেই গুলো জ্বেলে প্রত্যেকটার মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হয়। সেই খড়ের জাহাজের ছোট্ট পাল তুলে দিলে হাওয়ার বেগে সমুদ্রের বিভিন্ন দিকে এগিয়ে গিয়ে শীঘ্রই পুড়ে যায় এবং জাহাজের শেষ আলোটি নিবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী থেকে শেষ আত্মাটিও এক বৎসরের মত বিদায় নিলেন এই রকম ধারণা করা হয়।

জাপানী উপকথা

ছোট বেলা থেকে ঠাকুরমার কোলে ব'সে আমাদের দেশের অনেক উপকথাই তোমরা শুনেছ, এবার একটা জাপানী উপকথা ব'লব। কোন এক নগরে এক বুড়ো ও বুড়ী ছিল। অদূরে ছিল একটা পাহাড়—তারই তলদেশ দিয়ে ব'য়ে যেত ছোট্ট একটা নদী। সেই নদীর ধারে পাতায় ঘেরা ছোট্ট একটা কুটীরে তারা বাস ক'রত। প্রত্যেক দিন বুড়োটি সকালে উঠে পাহাড়ে যেত কাঠ কাটতে আর সেই কাঠ বেচে যা' কিছু পেত তা'তেই স্বচ্ছন্দে তা'দের সংসার চ'লে যেত। বুড়ী রোজ নদীতে যেত স্নান ক'রতে ও জল আন্‌তে। আর কোন অভাব না থাকলেও সংসারে কোন ছেলেমেয়ে না থাকায় বুড়ীর মনে মনে বড়ই দুঃখ ছিল।

একদিন বুড়ী নদীতে কাপড় কাচ্‌ছে এমন সময় একটা মস্ত বড় লাউ তা'র সাম্‌নে ভেসে এল। বুড়ীও সেটা নিয়ে বাড়ী চল্‌ল। পথে সে দু'একবার ছোট ছেলেমেয়ের কান্না শুন্‌তে পেল কিন্তু চারিদিক্ চেয়ে কিছু না দেখ্‌তে পেয়ে আবার চল্‌তে লাগল। আবার

সেই কান্না। ততক্ষণ বুড়ী বাড়ী পৌঁছেছে। একটা ছুরি নিয়ে এসে লাউটা কেটে দেখে তা'র মধ্যে একটা সুন্দর ছেলে। বুড়ীর ত আর আহ্লাদ ধরে না। ছেলেটাকে পেয়ে বুড়ী খুব যত্ন ক'রতে লাগল এবং তার নাম দিল "মমতারো"।

মমতারো ক্রমশঃ বড় হ'তে লাগ্‌ল এবং যখন তা'র বয়স সতের বৎসর তখন নিজের ভাগ্য অন্বেষণে বেরুবে ব'লে স্থির ক'রল। বুড়ো-বুড়ীর সে অন্ধের যষ্টি, কাজেই তা'রা অনেক বাধা নিষেধ ও চোখের জল ফেল্‌ল। কিন্তু কিছুতেই তা'র সঙ্কল্প ট'লল না। অগত্যা মমতারোর পথে কোন কষ্ট না হয় সেজন্য প্রচুর খাবার ও অন্যান্য জিনিষ সঙ্গে দিয়ে একদিন তা'কে বিদায় দিতে হ'ল।

কিছুদূর চলার পর মমতারোর সঙ্গে এক বোল্‌তার দেখা। সে বল্‌ল, "মমতারো, তোমার খাবার থেকে আমাকে একটু দাও, আমি তোমাকে যথেষ্ট সাহায্য ক'রব।" মমতারো তখনই তা'কে খাবারের অংশ দিয়ে আবার চল্‌তে লা'গল। কিছুদূর যেতে না যেতে তা'র সঙ্গে প্রথমে এক কাঁকড়া ও পরে একটি বাদাম ও এক টুক্‌রো পাথরের সঙ্গে দেখা হ'ল। তা'রাও তা'র কাছে কিছু খাবার চেয়ে তা'কে সাহায্য ক'রবে ব'লে প্রতিশ্রুতি

দিল। এখন এই পাঁচজন একত্রে অদূরে এক দৈত্যপুরীর দিকে অগ্রসর হ'ল।

দৈত্যপুরী পৌঁছে মমতারো দেখ্‌ল যে, প্রকাণ্ড বাড় নিস্তব্ধ, কোথাও কোন জনমানবের সাড়া-শব্দ নেই। দৈত্য নেই বুঝতে পেরে তা'রা এক যুক্তি ক'রল। বাদাম আগুনের ছাইয়ের মধ্যে লুকিয়ে থাক্‌ল, তা'রই পাশে একটা জলের পাত্রের ভিতর কাঁকড়া ব'সে থাক্‌ল, বোল্‌তা লুকিয়ে থাক্‌ল এক অন্ধকার কোণে এবং পাথরখানা ছাদের উপর উঠে ব'সে থা'কল। এরা এইভাবে থাকার পর মমতারো নিজে একটা ঘরের মধ্যে গিয়ে লুকোল।

বাইরে দারুণ শীত। দৈত্য বাড়ী ফিরেই প্রথমে আগুনে হাত গরম করার জন্য গেল এবং তৎক্ষণাৎ বাদাম ফেটে আগুন ছিট্‌কে লেগে তা'র দুই হাতই পুড়ে গেল। তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করার জন্য ছুটল সে জলের পাত্রের দিকে কিন্তু যেই সে জলের পাত্রের মধ্যে হাত দিয়েছে অমনি কাঁকড়া হাত কামড়ে রক্তপাত করে দিল। যন্ত্রণায় অধীর হ'য়ে সে ছুটে চল্‌ল ঘরের কোণে কিন্তু এখানেও তা'র নিস্তার নেই। সেই কোণে লুকিয়েছিল বোল্‌তা, সে বেরিয়ে এসে দৈত্যের মুখে এমনভাবে হুল ফুটিয়ে দিল যে, দৈত্য কি ক'রবে কিছুই বুঝতে না পেরে

ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরের দিকে ছুটে চল্‌ল। কিন্তু "নিয়তি কেন বাধ্যতে ?" যেমনি ঘর থেকে বেরিয়েছে অমনি সেই পাথরখানা ছাদ থেকে তা'র মাথার উপর প'ড়ল, ফলে দৈত্য তখনই মৃত্যুমুখে পতিত হ'ল। তখন আর মমতারোর আনন্দ দেখে কে ! প্রকাণ্ড বাড়ী, প্রচুর সম্পদ্ পেয়ে সে সেই দেশের রাজা হ'য়ে ব'সল এবং দেশ থেকে বুড়োবুড়ীকে এনে পরম আনন্দে কাল কাটাতে লাগল।

জাপানী সমাজ

আমাদের সমাজের মত জাপানী সমাজেও স্ত্রী ও পুরুষের সমান অধিকার নয়। পুরুষেরা নিজেদের বড় মনে করে এবং স্ত্রীলোকদের চিরদিনই পুরুষের আজ্ঞানু-বর্ত্তিনী হ'য়ে তা'দের অধীন থাক্‌তে হয়।

জাপানে বাহ্যিক অনুষ্ঠানপ্রিয়তা অত্যন্ত বেশী একথা তোমাদের আগেই বলেছি। প্রত্যেক কাজ তা'দের বাঁধা-ধরা নিয়মের মধ্য দিয়ে ক'রতে হয়। তা'দের রাগ হ'লে বাইরে তা' প্রকাশ না ক'রে আনন্দের ভাব প্রকাশ ক'রতে শিক্ষা দেওয়া হয়। দুঃখে কান্না পেলেও মুখে হাসি দেখাতে হয়। আজও কোন জাপানীকে গালাগালি দিলে সে মৃদু হেসে বার বার অভিবাদন করে। যখন সে খুব আস্তে কথা কইবে তখনই বুঝতে হবে সে রেগেছে। আগেকার দিনে জাপানীদের সম্মান-বোধ অত্যন্ত প্রখর ছিল তাই, তা'রা কখন কর্ত্তব্যে অবহেলা ক'রত না, কোন কর্ত্তব্যে অবহেলা হ'লে তার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ নিজ হাতে পেট

চিরে ফেল্‌ত। এই রকম মৃত্যুকে ওদেশে 'হারিকিরি' বল্‌ত।

সাধারণের সুখ ও সুবিধার দিকে এখানে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। প্রত্যেক গৃহস্থ যা'তে আগুন সাবধানে রাখে তাই মনে করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রত্যেকদিন অনেক রাত্রে একটা লোক দু'খানা কাঠ বাজাতে বাজাতে পথ দিয়ে চলে। জাপানে থিয়েটার বেলা দুই তিনটার সময় আরম্ভ হ'য়ে অনেক রাত পর্য্যন্ত হয়। থিয়েটার দেখ্‌তে গিয়ে জাপানী দর্শকেরা বাড়ীর মত আসনে ব'সে খাবার, চা প্রভৃতি খায়। রঙ্গালয়ে জুতো পায় দিয়ে প্রবেশের নিয়ম নেই। বাইরে থিয়েটারের চাকরের কাছে রেখে যেতে হয় এবং তা'র জন্য আলাদা ভাড়া লাগে। যবনিকা উঠার পূর্ব্বে আমাদের দেশে যেমন ঘণ্টা বা বাঁশী বাজে ওদেশে তেমনি দু'খানা কাঠে ঠকাঠক শব্দ করা হয়।

ভারতবাসীর মত জাপানীদেরও মাথায় টিকি থাক্‌ত। সামাজিক অবস্থার তারতম্য ও কা'র কি পেশা বোঝ্‌বার জন্য অতি প্রাচীনকাল থেকেই জাপানীদের টিকি রাখার নিয়ম ছিল। আজকাল এরা খুব ছোট ছোট ক'রে চুল ছাঁটে এবং প্রায় সকলেই দাড়ি গোঁপ এবং অনেকে কপাল ও ভ্রূর অনেক অংশ কামায়। আমাদের দেশের মত

নাপিত কা'রও বাড়ীতে আসে না, নাপিতের দোকানে গিয়ে চুল ছাটতে হয় কিন্তু কোন নাপিত নখ কাটে না।

কেশের সৌন্দর্য্যে জাপানী নারী বোধ হয় জগতের অন্যান্য নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যেমন কেশের প্রাচুর্য্য আছে তেমনি তা'দের যত্নেরও অভাব নেই। জাপানে যত রকম খোপা বাঁধ্‌বার নিয়ম আছে এরকম আর কোন দেশে নেই। এদেশে একদল মেয়ে আছে যা'দের পেশা পয়সা নিয়ে বাড়ী বাড়ী চুল বেঁধে দেওয়া।

অতিথিকে জাপানীরা অত্যন্ত সমাদর করেন। বাড়ীতে আগন্তুক যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একজন এসে মাথা নীচু ক'রে অভিবাদন জানিয়ে 'ইত্তে ইরাষযাই মাসি' অর্থাৎ আস্‌তে আজ্ঞা হোক্‌ ব'লে দাঁড়ায়। অতিথিকে বিদায় নেওয়ার সময় ব'লতে হয়, 'সায়োনারা' অর্থাৎ 'তা হ'লে', —এর উত্তরে গৃহস্থকে ব'লতে হয়, 'মাতা ইরাষযাই' অর্থাৎ আবার এস।

জাপানীদের বিয়েতে ছেলের বয়স অন্ততঃ সতেরো ও মেয়ের বয়স পনেরো হওয়ার দরকার, তবে সাধারণতঃ মেয়ের কুড়ি একুশ ও ছেলের চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়সের আগে বিয়ে হয় না। ছেলে বা মেয়ে নিজেরা বিয়ের ঠিক করে না। উভয় পক্ষের অভিভাবকেরা একজন ঘটক

নিযুক্ত ক'রে তারই মধ্যস্থতায় সমস্ত ঠিক করেন। পরে নিমন্ত্রণের সময় ছেলের ও মেয়ের বাপের নামে পত্র দেওয়া হয়। এবিষয়ে ওদের প্রথা অনেকটা আমাদের দেশের মত।

বিয়ের কথাবার্ত্তা ঠিক হ'য়ে গেলে কনে বরকে একদফা পোষাক পাঠিয়ে দেন এবং বর তাঁ'র ভাবী স্ত্রীকে একটি 'ওবি' উপহার দেন। তারপর নানা রকম খাদ্য ও পানীয় পরস্পরের বাড়ী থেকে পাঠানর নিয়ম আছে। আমাদের দেশে বর ক'নের বাড়ীতে বিয়ে ক'রতে যায় কিন্তু জাপানে তা'র বিপরীত; কনে বরের বাড়ীতে বিয়ে করতে যায়। বিয়ের দিন সকালে ক'নে বড় বড় কাঠের সিন্ধুকে তা'র পোষাক-পরিচ্ছদ ও গৃহস্থালীর উপকরণ বোঝাই ক'রে বরের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়। যা'রা নিয়ে যায় তা'রাও কিছু কিছু পুরস্কার পায়।

সেদিন মেয়ে শ্বেত রেশমী পোষাক পরে ও তা'র উপরে ক্রেপের আবরণ থাকে; বর সাধারণ জাপানী ভদ্রলোকের পোষাকে ক'নের প্রতীক্ষায় থাকেন। যে ঘরে বিয়ে হয় সেটা বাঁশ, দেবদারুর ডাল ও কুলের ফুলে সাজান থাকে, কেননা এই তিনটি জাপানী মতে মাঙ্গলিক চিহ্ন। যে ঘরে বিয়ে হয় সেখানে বড় জোর বারজন বস্‌বার নিয়ম।

ঘরে প্রবেশের আগে ক'নে পাতলা কাপড় দিয়ে তাঁ'র মুখ ঢেকে রাখেন। বর ও ক'নে মুখোমুখি বসেন। তাঁ'দের মাঝে সাদা রংয়ের চৌকো আঠার ইঞ্চি উঁচু কাঠের টেবিল থাকে; টেবিলের উপর 'সাকে'র পেয়ালা।

আসল কাজটা খুবই সহজ। বিয়ের সময় কোন মন্ত্র পাঠ বা প্রতিজ্ঞা বা উপাসনা কিছুই নেই। বর-ক'নে তিনটি পেয়ালাতে তিনবার ক'রে সাকে পান ক'রলেই বিয়ে হ'য়ে গেল। তারপর নব দম্পতী তাঁ'দের পিতা-মাতাকে সাকে দেন এবং এরপর সাধারণ বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে ভোজ দেওয়া হয়। একত্রে ঐ ভাবে সাকে পানের তাৎপর্য্য এই যে, ভবিষ্যতে স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ ক'রবে।

জাপানে বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও কনফুসিয়াসের মতাবলম্বী অনেকে আছেন। কিন্তু শিন্তো ধর্ম্মই জাপানের রাজ-ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মই তা'দের মধ্যে স্বদেশপ্রীতির সৃষ্টি ক'রেছে এবং একনিষ্ঠ কর্ত্তব্যবোধ জাগিয়েছে। তাই প্রকৃত পক্ষে এই ধর্ম্মই প্রত্যেক জাপানীর ধর্ম্ম।

জাপানে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীর মৃত্যু হ'লে তা'র মৃতদেহ ভস্মীভূত ক'রে ভস্মাবশেষ সমাহিত করা হয়। শিন্তো ধর্ম্মাবলম্বীর মৃতদেহ সমাহিত করা হয়। আমাদের দেশের

মতই মৃতব্যক্তির পারলৌকিক কাজে তা'র সর্ব্বাপেক্ষা নিকট আত্মীয়ের অধিকার। ইনি নারী হ'লে এঁকে সাদা পোষাক প'রতে হয় এবং চুলের আগায় সাদা কাগজ বাঁ'ধতে হয়। জাপানে কেউ মারা গেলে সাধারণতঃ চব্বিশ ঘণ্টা রেখে পরে কবর দেওয়া যেতে পারে। মৃত ব্যক্তির সমাজে পদের উচ্চতা অনুসারে শব কম বা বেশী দিন বাড়ীতে রাখা হয়। যে যত সম্মানীয় তা'র শব তত বেশী দিন বাড়ীতে থাকে। মৃতদেহকে সাদা পোষাক পরিয়ে বিছানার উপর চিৎ ক'রে শুইয়ে দেওয়া হয়। সে ঘরে দিন-রাত্রি একজনের জেগে থাকা দরকার। এজন্য অনেক সময় একজনের পক্ষে সম্ভব হয় না ব'লে দুই তিন জনে পালা ক'রে রাত্রি জাগে।

মৃত্যুর চা'রদিন পরে মৃতদেহ কাঠের শবাধারে রাখা হয়। এই সময় পুরোহিত বলেন, "জীবিত কালের মত তোমার দেহ এখানে রাখ্‌তে ইচ্ছা হ'লেও লোকাচার অনুসারে দুঃখের সঙ্গে সমাহিত ক'রতে হবে।" তারপর মৃতদেহের কাছে একখানা আয়না রেখে বলেন, "তোমার দেহ অন্যত্র সমাহিত হ'লেও তোমার আত্মা সর্ব্বদা এখানে উপস্থিত থেকে এ বাড়ীর মঙ্গল কার্য্য ক'রতে যেন বিরত না থাকে।" কুলুঙ্গিতে কুলদেবতার কাছে এই আয়না

ও একখানা কাষ্ঠফলকে লেখা মৃত ব্যক্তির নাম রাখা হয়। মৃত ব্যক্তিকে দেখ্‌তে না পেলেও তাঁ'র অস্তিত্ব অনুভব ক'রবার জন্য প্রত্যেক কাজের প্রথমে গৃহস্থকে এখানে একবার ক'রে আস্‌তে হয় এবং প্রতিদিন সন্ধ্যায় সেখানে প্রদীপ জ্বেলে দেওয়া হয় ও আহারের সময় মৃত ব্যক্তির আত্মার উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়।

জাপানী শবযাত্রায় কোন জঁাকজমক নেই। প্রথমে কয়েকজন লোক একখানা বাঁশের চারিধারে ফুল বেঁধে নিয়ে যায়। তারপর কয়েক জন শবাধারটি কাঁধে ক'রে নিয়ে যায়। তা'র পিছনে একদল পুরোহিত। সকলের শেষে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন হেঁটে বা রিক্সায় যান। মেয়েরা কখনও হেঁটে শবের পিছনে যায় না। কবরের মধ্যে শবাধারটি নামিয়ে সর্ব্বাপেক্ষা নিকট আত্মীয় বা আত্মীয়া প্রথমে কোদাল দিয়ে গর্ত্তের মধ্যে মাটি ফেলেন। তারপর আর সকলে মাটি দিয়ে গর্ত্ত ভর্ত্তি ক'রে দেন। প্রথম বছর কবরের উপর একখানা কাষ্ঠফলকে মৃতের নাম-ধাম লিখে পুঁতে রাখা হয় এবং এক বছর পরে ওখানে প্রস্তরফলক হয়। মৃতব্যক্তির বাড়ীতে প্রতি মাসে তাঁর মৃত্যু দিনে তাঁ'র উদ্দেশে পূজাদি হয়।

ভূমিকম্পের পর

আমাদের দেশের মত জাপানে কয়েক বছর আগেও কৃষিশিল্পই ছিল প্রধান। এরা যে কি রকম উন্নতিশীল ও কর্ম্মনিষ্ঠ জাতি তা'র পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র কয়েক বছরের জাপানের ইতিহাস পাঠ ক'রলে। মাঝে মাঝে ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত এদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিতে চায় কিন্তু তা'তে এরা হতাশ হবার জাতি নয়। আবার নবীন উদ্যমে নিজেদের সঙ্কল্প সিদ্ধির চেষ্টা করে।

মাত্র কয়েক বছর আগে ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে টোকিওতে যে ভীষণ ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাত হয়েছিল, আর দেশবাসী তা'তে যে রকম ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তা' অন্য জাতি হ'লে বহুদিন পর্য্যন্ত তাদের নাম ও কার্য্যকলাপ সাধারণের কাছে অপ্রকাশিত থাকৃত। কিন্তু জাপান এতে ভগ্নোৎসাহ না হ'য়ে নূতন উদ্যমে কাজ ক'রে ধ্বংসের পূর্ব্বের জাপান থেকে অনেক উন্নতি লাভ ক'রেছে। এরা ধরার বুকে একটা প্রকৃত জীবন্ত জাতি, কর্ম্মের উৎস।

এইবার ভূমিকম্প সম্বন্ধে বল্‌ব। ১৯২৩ সালের ১লা সেপ্টেম্বর দুপুর বেলা হঠাৎ জাপানে ভীষণ ভূমিকম্প আরম্ভ হ'ল। কম্পনের পর কম্পন। প্রথম দিন ২২৬ বার ও পরদিন তিন ঘণ্টার মধ্যে ৫৭ বার কম্পন অনুভূত হয়। পঁয়তাল্লিশ হাজার স্কোয়ার মাইল ব্যাপী পাঁচটি প্রকাণ্ড সহর ও সাত লক্ষ অধিবাসী এই ভীষণ ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নগরের আট ভাগের সাত ভাগ ধ্বংসের গ্রাসে পড়ে। এতেও নিস্তার নাই। এরপর আরম্ভ হ'ল আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত। এই আগুন ক্রমশঃ বাড়্‌তে বাড়্‌তে প্রায় পঁচিশ মাইল ব্যাপী সীমানার উপর ছড়িয়ে পড়্‌ল। এই সময় জাপানে অনেক সরু গলি ও কাঠের বাড়ী ছিল; আগুন লাগ্‌লে অনেকে বাড়ীর বাইরে এসে পথের অভাবে দু'পাশের জ্বলন্ত আগুনের চাপে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরণকে বরণ করেছিল।

এই ধ্বংসের পর যখন নূতনভাবে জাপানে ঘরবাড়ী তৈরীর নক্সা হ'ল, তখন তাঁ'রা প্রধানতঃ এই করলেন যে, একটা রাস্তা পূর্ব্ব থেকে বরাবর পশ্চিমে ও আর একটা উত্তর থেকে দক্ষিণে সহরের ভিতর দিয়ে চ'লে যাবে; এই দুটো প্রধান রাস্তা থেকে অন্যান্য রাস্তা

বেরুবে। এই নূতন জাপানে অনেক বাড়ী ও পার্ক তৈরী হ'য়েছে, খাল কাটানর ব্যবস্থা হ'য়েছে এবং ইলেক্‌ট্রিকের সাহায্যে সুন্দর আলোর ব্যবস্থা হ'য়েছে। ১৯২৩ থেকে ১৯৩০ পর্য্যন্ত আট বছরে নবীন জাপান তৈরী ক'রতে মোট ৮৪৭,৫০০,০০০ ইয়েন (জাপানী মুদ্রা) খরচ হ'য়েছে। এ ছাড়া গবর্ণমেণ্টের বাড়ী তৈরীর পৃথক্ খরচ আছে।

টোকিও ও ইয়োকোহামাতে প্রায় পাঁচশ' পোল তৈরী হ'য়েছে, ভূমিকম্প ও আগুনে যা'দের কোন ক্ষতি ক'রতে পা'রবে না। কাঠের বাড়ীর পরিবর্ত্তে যে সব বাড়ী তৈরী হ'য়েছে তা'দেরও ভূমিকম্প ও আগুনের ভয় নেই। তবে এতে জাপানের নিজস্ব সম্পত্তির অনেক লোপ পেয়েছে। প্রকৃত পক্ষে জাপান গত কয়েক বৎসরে যে উন্নতি ক'রেছে অনেক জাতির তা'র জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী প্রয়োজন হ'ত।

সহর ধ্বংসের পর পুনঃ নির্ম্মাণ উৎসব উপলক্ষ্যে ১৯৩০ সালের মার্চ্চ মাসে তিন দিন নানা রকম আনন্দের অনুষ্ঠান হয়। সম্রাট্ রোলস্‌-রয়েস্ গাড়ীতে চ'ড়ে আরও প্রায় ত্রিশখানি গাড়ীর সঙ্গে বিশ মাইল ব্যাপী নূতন গৃহ নির্ম্মাণ পরিদর্শন করেন। জাপানের যেখানে ১৯২৩ সালে প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা প্রমাণ করতে তেত্রিশ হাজার

লোক ধ্বংসকে বরণ ক'রে নিয়েছিল সেখানে সেই অনামী অধিবাসীদের-স্মৃতি রক্ষার্থে একটা বাড়ী তৈরী হ'য়েছে। এখানে সম্রাট্ কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে মৃত ব্যক্তিদের আত্মার প্রতি সম্মান দেখিয়েছিলেন।

জাপানীরা জগতের সভ্য সমাজে নিজদিগকে সভ্য ও উন্নতিশীল জাতি ব'লে পরিচয় দিতে খুবই আগ্রহান্বিত। এ বিষয়ে তা'রা অনেকটা কৃতকার্য্যও হ'য়েছে। পৃথিবীর সমস্ত দেশের সঙ্গেই জাপান বাণিজ্য সূত্রে আবদ্ধ হ'য়েছে। স্বদেশের গৌরবে জাপানীদের বক্ষ স্ফীত হ'য়ে ওঠে। সেকালের জাপানীরা দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, নদী, ফুজিসান পর্ব্বত প্রভৃতির গর্ব্ব করে কিন্তু নবীন জাপানের কাছে তা'দের কল-কারখানা সৃষ্টি ও চারিদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধিই গর্ব্বের কারণ।

পরিশিষ্ট

এই বই লিখ্‌বার আগে চীন-জাপানের সংবাদের জন্য কয়েকটা বড় বইয়ের দোকান, প্রবাসী অফিস, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী প্রভৃতি ঘুরে যে ক'খানা বইয়ের খবর পেয়েছি, আগ্রহান্বিত পাঠক-পাঠিকাদের জন্য নীচে তা'দের নাম দিলাম। এর দ্বারা যদি কেউ উপকার পান তা'হলেই আমার শ্রম সার্থক হ'বে।

গ্রন্থপঞ্জী

অজিত মুখোপাধ্যায়—চীনের যৌবন অভিযান

অরুণচন্দ্র গুহ—চীনের যুবক জাগরণ

ইন্দুমাধব মল্লিক—চীন ভ্রমণ (১৩২৩, ১৬৮ পৃঃ)

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—চীন যাত্রী

জ্যোতিষ গঙ্গোপাধ্যায়—সান ইয়াৎ সেন ও বর্ত্তমান চীন (১৩৩৩, ১৪৮ পৃঃ)

প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী—ভারত ও ইন্দোচীন

বিনয় সরকার—হিন্দু চোখে চীনা ধর্ম্ম ("চাইনীজ রিলিজ্যান থ্রু হিন্দু আইজ" শাংহাই ১৯১৬, ৩৬৫ পৃঃ)

—চীনা সভ্যতার অ আ ক খ (১৯২৩, ২৫০ পৃঃ)

—নবীন এসিয়ার জন্মদাতা জাপান (১৯২৭, ৪৮৫ পৃঃ)

—বর্ত্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য (১৯২৮, ৪৫০ পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—জাপানে পারস্যে

সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়—জাপান (১৩১৭, ১৯৫ পৃঃ)